# দ্বিতীয় অধ্যায়

# স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার রূপরেখা

২. সূচনা

২.১ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

২.২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

২.৩ স্বাধীনতার প্রাক্-পর্ব : কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণ

২.৪ স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থান : ‘অপর’ থেকে ‘প্রতিপক্ষ’-এ উত্তরণ

২.৫ সারাংশ

## ২. সূচনা

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন ঠিকই কিন্তু সে শক্তি পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই ছিল। ঠিক তেমনই সমাজে নিম্নবর্গীয় চেতনা ও তত্ত্বের আবিষ্কার ১৯৮২ সালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে হলেও নিম্নবর্গ সমাজে বরাবর ছিলই। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা বরাবর নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিম্নবর্গকে পায়ের তলায় পিষে মেরেছে। প্রাচীনকালে 'বর্ণ', 'শ্রেণি', 'পেশা' ও 'বিত্ত' নির্ভর অনগ্রসরতাকে ভিত্তি করে একদল মানুষকে সমাজ কাঠামোর তলদেশে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় প্রধানত 'বিত্ত'গত ও 'ক্ষমতা'গত অনগ্রসরতা নিম্নবর্গের মূলসমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এই সমস্যার কথা ইতিহাসে যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনই সাহিত্যেও। বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যে উপরিউক্ত সমস্যার চিত্র বিস্তৃতভাবে দেখা যায়।

আমরা জানি, ১৯৮২ সালে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গ-চর্চা শুরু হয়। কিন্তু প্রশ্ন আসে, বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থান কি তারপর? নিশ্চয়ই নয়। ঠিক যেমন ভাষার আগে ব্যাকরণ নয়, ঠিক তেমনই ইদানীং আমরা যাকে সাবঅলটার্ন, নিম্নবর্গ, অপর, ব্রাত্য, দলিত, প্রান্তিক, অন্ত্যজ যা-ই বলি না কেন; তার যোগসূত্র আসলে ১৯২৯-১৯৩৫ সালে লেখা আন্তনিও গ্রামশির 'প্রিজন নোটবুক'-এ উল্লেখিত 'সাবঅলটার্ন'-এর সঙ্গে নেই। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণের সূচনা হয়ে গিয়েছিল প্রাচীনকালেই। যার প্রতিফলন পরবর্তীকালে বিশেষ করে বাংলা কথাসাহিত্যে স্পষ্ট হতে শুরু করে। এক্ষেত্রে লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিভাজনরেখা লক্ষ করা গিয়েছে। একদল লেখক এলিট শ্রেণির তরফদারি করলেন এবং আরেকদল নিম্নবর্গীয় সমাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিম্নবর্গকে সহমর্মিতা ও যথার্থ বিবেচনার সঙ্গে তাদের সংকট-সমস্যাকে তুলে আনলেন। ফলে কথাসাহিত্যে একটি বৈষয়িক বৈচিত্র্য এল। সমাজে তথাকথিত শূদ্র, প্রান্তিক, অপর, দলিত, অন্ত্যজ হিসেবে পরিচিত মানুষগুলি সাহিত্যের মঞ্চে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আওয়াজ তুলতে শুরু করল বা বলা ভালো, বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থানের একটি আন্দোলন শুরু হল। কথাশিল্পে বিষয় উপস্থাপনে দেখা গেল দুটি ভাগ- (১) উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ। (২) মুখ্য রূপে নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্য নির্মাণ।

বাংলা কথাসাহিত্যের উন্মেষ পর্ব অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬১-৬২) এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের আখ্যানে কাহিনির প্রয়োজনেই নিম্নবর্গকে দেখা গিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রধান চরিত্র হিসেবে নয়। মেধা,

সহানুভূতি এবং সৃজনশীলতার ক্ষমতায় তাঁরা নিম্নবর্গকে কল্পনা করেছেন মাত্র। কিন্তু কল্লোল যুগ ও তৎপরবর্তীকালে কথাসাহিত্যে আমরা নিম্নবর্গকে স্বমহিমায় উঠে আসতে দেখেছি। নিম্নবর্গপ্রধান কথাসাহিত্য আজ বাংলা সাহিত্যে যে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে বাংলা সাহিত্যে আদিকাল থেকেই নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে- কোথাও ক্ষীণ, কোথাও প্রবল। বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্ন থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি কীরূপ- তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমাদের সামনে থাকলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের স্থান কীভাবে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে মঞ্চায়িত হল—সে ধারণাটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। আলোচনার অবকাশে আমরা সেই দিকটি সংক্ষেপে দেখে নেব।

## ২.১ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

চর্যাপদের সময়কাল গবেষকদের মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের পথচলা শুরু হলেও সেখানে নিচুতলার মানুষ উপেক্ষিত নয়। বরং তাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে রয়েছে চর্যাপদে। সেদিক থেকেও চর্যাপদের একটি আলাদা গুরুত্ব তৈরি হয়েছে নিঃসন্দেহে। পদকর্তারা স্বয়ং নিম্নবর্ণের বলে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার মধ্যেও রয়েছে নিম্নবর্গকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার আভাস। বিভিন্ন চর্যাপদে তৎকালীন সমাজচিত্র লক্ষ করা যায়, যেখানে অন্ত্যজ, প্রান্তিক মানুষদের ছবি উঠে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য- ১০, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৮, ৪৫, ৫০ নং চর্যাপদ। যেমন- ১০ নং চর্যায় বলা হয়েছে, ডোম জাতীয় রমণী অস্পৃশ্য বলে নগরের বাইরে কুড়ে ঘরে তার স্থান, কিন্তু তার রূপ ব্রাহ্মণ জাতিকেও যেন ছুঁয়ে যায়।

> ‘নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
> ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।। ধ্রু।।’ (দাশ ১৯৯৭, পৃ. ১৩৭)

শান্তি পা-র ২৬ নং পদে ধুনুরিদের কথা বলেছেন।

> ‘তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।
> আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু।। ধ্রু।।’ (দাশ ১৯৯৭, পৃ. ১৭৭)

এরকমই বিভিন্ন পদগুলি থেকে আমরা তৎকালীন সমাজের একটি চিত্রের পরিচয় পাই। যেখানে অন্ত্যজ-প্রান্তিক মানুষদের কথা উঠে এসেছে। লক্ষণীয়, প্রান্তিক-অন্ত্যজ মানুষগুলি কিন্তু কখনোই স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে আসেনি, এসেছে সমাজচিত্রকে পূর্ণ করতে। সরাসরি চরিত্রে প্রতিপন্ন না হলেও তাদের উল্লেখ চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে ত্বরান্বিত করেছে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৫, পৃ. ১৫-১৬)

প্রাক্‌-মধ্যযুগের একমাত্র বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। গবেষকরা মনে করেন, পল্লিগ্রামের পরিবেশের দিকে তাকিয়ে গ্রাম্য রুচিতে ও নাটকীয়তায় গ্রামবাসীর চিত্ত বিনোদনের জন্য কবি এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। গ্রাম্য রুচিতে ও গ্রামবাসীদের জন্য কাব্যটি রচিত বলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই উঠে এসেছে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা। কৃষ্ণ এখানে কোনো পৌরাণিক অবতার নয়, নিছক নিম্নশ্রেণির একজন রাখাল কামাতুর চরিত্র। রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি তিনটি চরিত্রকে কবি গোপজাতি ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। গোপেরা সমাজের নিম্নশ্রেণির কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ ও পরস্পরের ভাষা ব্যবহারকে লক্ষ করলে তাদের সমাজের অন্ত্যজশ্রেণি বলেই মনে করা হয়। রাধার দুধজাত দ্রব্য বিক্রি করার বর্ণনা নিম্নবর্গের অবস্থানকেই স্পষ্ট করে। এইরকম শ্রমজীবী মানুষের চিত্র উঠে এসেছে কাব্যে। অন্যদিকে রাধার সংস্কারে তেলিনিরা অন্ত্যজ। তাদের তেল বেঁচতে যাওয়ার দৃশ্য দেখা অশুভ। সমগ্রকাব্যে অন্ত্যজ, নিম্নশ্রেণির সামাজিক চিত্রের পাশাপাশি অসংখ্য লৌকিক উপাদানও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। (ভট্টাচার্য ১৯৬৯, পৃ. ১১৫-১২৫)

## ২.২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ

মধ্যযুগে আমরা পেলাম অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, জীবনীসাহিত্য, লোকগাথা, গীতিকা, ইসলামী সাহিত্য প্রভৃতি। যেখানে মানুষের জন্য, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের কথাই লেখা হল আর সেই মানুষগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উঠে এল সমাজের নিম্নস্তর থেকে। মধ্যযুগের সাহিত্যের এই বিশাল পরিসর অন্বেষণ করলে দেখা যাবে সর্বত্রই কোনো না কোনোভাবে উঠে আসছে সমাজের নিম্নবর্গস্থিত মানুষ ও তাদের জীবন।

পাঁচালি গানের আকারে রামায়ণের প্রথম বাংলা ভাবানুবাদ করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। সমাজের সর্বস্তরের জন্য যে কাব্য লিখিত সেখানে স্বাভাবিকভাবে নিম্নস্তরের মানুষেরা বাদ পড়েনি। মূল রামায়ণে নিম্নশ্রেণির প্রসঙ্গগুলি সেভাবে উঠে না এলেও বাংলা ভাবানুবাদে রামের আর্য পরিবারকে বাদ দিয়ে যে রাক্ষস ও বানর সমাজ রয়েছে তারা সেই আর্যের কাছে ব্রাত্যশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ব্রাত্য হয়েও তারা আর্যদের কাছে হার মানেনি। আবার রাক্ষসদের মতো বানর সমাজ ততটা উন্নত নয়। অন্যদিকে ‘হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান’-এ অন্ত্যজ জীবনের একটি চিত্র দেখতে পাই। নিম্নশ্রেণির হাড়িরা শূকর পালন করত, শ্মশানে শবদাহ করত। এই হাড়িরা আর্থিক দিক থেকে যতটা না নিম্নবর্গ তার থেকে অনেক বেশি সামাজিক স্বীকৃতির দিক থেকে। একজন রাজা নিয়তির চক্রে ক্ষমতা বিচ্যুত হয়ে হাড়িতে পর্যবসিত হয়ে

এই উদাহরণই স্থাপন করে যে ক্ষমতা স্থির নয়, ক্ষমতার পরিবর্তনে নিম্নবর্গের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়। রামায়ণে যে সব অন্ত্যজবর্ণের মানুষের কথা আছে তারা সকলেই আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে নয়। যেমন গুহক-চণ্ডালরা অন্ত্যজ বর্ণের হলেও তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। সমগ্র কাব্যেই চেড়ী, হাড়ি, গুহক-চণ্ডাল, শবর, কৈবর্তদের উল্লেখ রয়েছে।

কাশীরাম দাস অনূদিত 'মহাভারত'-এ নিম্নবর্গের উপস্থিতি সেভাবে না থাকলেও বাঙালি জীবনের সাধারণ চিত্র এখানে উঠে এসেছে। মহাভারতের আদিপর্বে মৎস্যগন্ধার কাহিনি প্রসঙ্গে তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণি কৈবর্তদের জীবনযাপনের উল্লেখ রয়েছে। একলব্যের অস্ত্র শিক্ষা প্রসঙ্গেও সমাজের নিষাদ শ্রেণির কথা এসেছে যারা ব্রাত্য বলে বিবেচিত। নিম্নশ্রেণির নিষাদ বংশের একলব্যের গুরুর প্রতি একনিষ্ঠতা, ভক্তির কোনো মূল্যই কেউ দেয়নি। আমাদের অবাক করেছে সমাজের উচ্চশ্রেণিরা কীভাবে নিম্নশ্রেণিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়, কর্ণের প্রতি অবিচার আমরা ভুলব কী করে। সমাজ কাঠামোর নির্মম নিয়মে তারা ব্রাত্য থেকে গিয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল সমাজের বৃহত্তর অশিক্ষিত ও নিচু তলার মানুষদের কাছে আত্মতৃপ্তি ও সুধার নামান্তর। মূলত তিনধরনের প্রধান মঙ্গলকাব্য এই ধারাকে পুষ্ট করেছে- (১) মনসামঙ্গল (২) চণ্ডীমঙ্গল (৩) ধর্মমঙ্গল। নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনায় বলা হয়েছে, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ ধারণায় ক্ষমতাই হল মূল কথা। এই কথার প্রভাব দেখা গিয়েছে মনসামঙ্গলে। চাঁদ সওদাগর উচ্চবর্গ, ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী ও উচ্চবর্ণের। কিন্তু মনসার কোপে যখন তিনি নিঃস্ব হলেন তখন বিত্তশালী জগাই মণ্ডলের কাছে তিনি অন্ন ভিক্ষা করেছেন। তার নির্দেশে চাঁদ সওদাগর ধান নিড়ানির কাজে নিযুক্ত হয়ে সমস্ত ধান গাছ কেটে জগাই মণ্ডলের কোপে পড়ে। প্রহার করা হয় চাঁদবেনেকে। অর্থাৎ প্রমাণিত হয় ক্ষমতা যতক্ষণ আমিত্ব বহন করে ততক্ষণ সে উচ্চবর্গ বা এলিট ক্লাস। ক্ষমতাচ্যুত হওয়া মানেই নিম্নবর্গের সামিল হওয়া। নিম্নবর্গের ইতিহাস- বারবার এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছে।

শধু 'মনসামঙ্গল' নয়, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ছবি স্পষ্ট। কালকেতুর গুজরাট রাজ্যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র তো ছিলই, এছাড়া কবি মুকুন্দরাম নিম্নবর্গের নির্দিষ্ট পরিচয় তুলে ধরেছেন, যেখানে বৃত্তিনির্ভর নিম্নবর্গ যেমন- কুম্ভকার, তন্তুবায়, সালই, বারুই, নাপিত, ব্যাধ, ধীবর, ছুতোর, মাঝি, চণ্ডাল, চর্মকার, ডোম, হাড়ি ইত্যাদি ব্রাত্যশ্রেণির উল্লেখ করেছেন। নিম্নবিত্ত ও নিম্নবৃত্তির কালকেতু নিম্নবর্গ। কিন্তু দৈবক্রমে দেবী চণ্ডীর বরে সাতঘড়া মোহর পেয়ে হঠাৎ করেই অর্থনৈতিক

ক্ষমতা সৃষ্টি করে নিম্নবর্গ কালকেতুকে রাজা বানিয়ে উচ্চবর্গে পর্যবসিত করা হচ্ছে। কারণ দেবী চান উচ্চবর্গের পুজা পেতে, নিম্নবর্গের নয়।

ধর্মমঙ্গলের চিত্র এখানে একটু ভিন্ন। এখানেও অবশ্যসম্ভাবীভাবে বর্ণগত বিভাজন রয়েছে। লক্ষণীয় ধর্মমঙ্গলে আছে ডোম সমাজের কাহিনি। ব্রাহ্মণ নয়, ডোম সমাজের লোকেরাই ধর্মঠাকুরের পূজারি। কারণ ঐতিহাসিকেরা ধর্মঠাকুরকে বৈদিক সূর্যদেবতা বলে অভিহিত করেছেন, আর এই সূর্যদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল এই ডোম জাতির মধ্যেই। মঙ্গলকাব্যগুলি আসলে জাতীয় জনজীবনে ও সমাজের নিচুতলার মানুষেরই জয়গান। কবিরা দেব-দেবীকেও সেই নিম্নস্তরে নামিয়ে এনে নিম্নশ্রেণির মানুষের হারানো গৌরবকেই সম্মান জানতে চেয়েছেন। (মুখোপাধ্যায় ১৪১৩, পৃ. ৮৬-১৮৭)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য-শিল্পের পরিবর্তন চোখে পড়ে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা গদ্যের যে প্রচলন শুরু হয় তাতে ধীরে ধীরে গদ্যের বিভিন্ন ব্যবহার সাহিত্যকদের মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উপন্যাস নামক শিল্পের উত্থান এই সময় দেখা যেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনায় ‘সভ্যতার পিলসুজেরা’ বরাবরই ছিল। তাঁর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গেরা প্রধানভাবে উঠে না এলেও তিনি তাদের সমাজের মূল কাণ্ডারি হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর নানা প্রবন্ধে এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি। সাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি-অবস্থান থেকে তাদের স্বর-চেতনার প্রকট হওয়া এবং উচ্চবর্গের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিম্নবর্গের নির্মাণ বিষয়টির ক্রমবিকাশের ধারাটিকে বুঝতে হলে আমাদের স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ও অবস্থানের বিষয়টিকে সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা দেখে নেব স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থানের প্রাক্‌পর্বকে।

## ২.৩ স্বাধীনতার প্রাক্‌-পর্ব : কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ রূপ আমরা মূলত দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নিম্নবর্গ সেভাবে উপস্থাপিত না হলেও তাঁর কথাসাহিত্যে সমাজের নিম্নবর্গের একটি আকল্প তৈরি হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিশেষ করে ‘গল্পগুচ্ছ’-র রবীন্দ্রনাথকে অনেকটাই নিম্নবর্গের কাছাকাছি দেখা গিয়েছে। যেমন ‘অনধিকার প্রবেশ’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘হালদারগোষ্ঠী’, ‘সমস্যাপূরণ’ প্রভৃতি গল্পের কথা যেখানে সামন্ততন্ত্রের ছবি উঠে এসেছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে ব্রাত্য প্রজাদের প্রতিবাদী গোষ্ঠীচেতনা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ক্ষেত্রে ‘গোরা’ (১৯১০)-উপন্যাসে

গোরার চোখে ভারতবর্ষের দর্শন যে স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সে স্তরে রয়েছে সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি, অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের ভেদাভেদ, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, জড়তা, রক্ষণশীলতা। গোরা তাদের চিনতে পেরেছে 'সভ্যতার পিলসুজ' রূপেই। শরৎসাহিত্যেও সমাজবিভক্ত নিচুতলার ব্রাত্যশ্রেণিকে লক্ষ করা গিয়েছে। তাঁর লেখায় হাড়ী-বাগদীর প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে গ্রাম্যজীবন ও মানুষের সুখ দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনি বের করে এনেছেন। পল্লিগ্রাম ও পল্লিসমাজের জীবন্ত চিত্র শরৎচন্দ্রের লেখায় আমরা দেখেছি। শরৎসাহিত্যে সমাজের সাধারণ মানুষের নিম্নবর্গ রূপে যে অবহেলা, উপেক্ষা ও নিপীড়নের চিত্র উঠে এসেছে তা অত্যন্ত বাস্তব। 'পল্লিসমাজ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মহেশ', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে।

১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কল্লোল লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং সেই গোষ্ঠী দ্বারা রবীন্দ্র সাহিত্য ভাবধারার বিরোধিতা, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঁক বদল করেছে। উচ্চবর্গীয় ধারণায় সাহিত্য সৃষ্টি থেকে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সমাজের প্রান্তে থাকা ব্রাত্য মানুষগুলির অন্দরমহলের দিকে। তবে তাঁদের এই বিরুদ্ধাচরণ যে সাহিত্যের মূলমঞ্চে নিম্নবর্গকে এনে দাঁড় করিয়েছে এমন কথা বলার মধ্যে মৌলিকতা নেই। কারণ বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎসাহিত্যে ব্রাত্যজনের অভাব নেই। তবে সমালোচকের কথায়-

> 'তাঁরা সমাজের অন্তেবাসীদের বহু বিচিত্র জীবন যন্ত্রণার বেদগান রচনা করেননি। কল্লোলীয়রা এই উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন, কুলি-মুটে-মজুরের অস্তিত্বের নানা সংকট কাহিনির বয়ানে ব্যক্ত করতে চাইলেন।'
>
> (সিংহ রায় ১৯৭৩, পৃ. ১৬৪)

সমালোচকের এই মন্তব্যের যথার্থতা আমরা খুঁজে পেলাম 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'দিনমজুর' গল্প প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে দেখা গেল, দিন মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা ও বঞ্চনার চিত্র। কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ে শৈলজানন্দ লিখলেন 'কয়লাকুঠি' নামক গল্প যেখানে শ্রমজীবী মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও চেতনার প্রতিফলন লক্ষণীয়। যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালি' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে ব্যঙ্গের ছলে উঠে এসেছে তথাকথিত নিম্নবর্গেরই দৈনিক পাঁচালি। এছাড়া কল্লোল গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা দায়িত্ব সহকারে সমাজের ব্রাত্য বঞ্চিত মানুষের পাঁচালি গ্রন্থনে সচেষ্ট থেকেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, বনফুল, শৈলজানন্দ প্রমুখ লেখকেরা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উল্লেখযোগ্য পাঁক (১৯২৪) উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে মুচি, মেথর ও বস্তিবাসীর জীবনযাত্রা। 'উপনায়ন' উপন্যাসেও রয়েছে নিম্নবিত্ত সর্বহারা ভিখারিদের আর্তনাদ ও দুর্দশার জীবনচিত্র। শুধু উপন্যাস নয়, গল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত লেখক তাঁর গল্পগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তুলে এনেছেন নিম্নবর্গকে। 'মহানগর', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'-র মতো গল্প সৃষ্টি করে তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি নিছক জীবনের রূপকার নন, একজন বিচক্ষণ সমাজবিশ্লেষকও। 'সংসার সীমান্তে'-র নায়ক নায়িকা অস্তিত্বের সংগ্রামে যথাক্রমে বেছে নেয় চৌর্যবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি। সমাজ কাঠামোর নিষ্ঠুর নিয়মে তারা ছিটকে যায় সমাজের মূলস্রোত থেকে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখাতেও এসেছে সমাজের বঞ্চিত গোষ্ঠীরা। তাঁর প্রথম দিকের গল্পের মধ্যে 'ভুখা' গল্পটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। শৈল নামক চরিত্রটি বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করেছে তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে। কিন্তু ভিক্ষার বদলে তাঁর কপালে জুটেছে প্রহার ও অপমান। সন্তানকে সে বাঁচাতে পারেনি। তাহলে তাঁর সন্তানের জন্য কে দায়ী-এই উত্তর খুঁজেছেন লেখক। আবার 'ধন্বন্তরি' গল্পে রয়েছে একজন গরিব রোগীর অসহায় অবস্থা যে ধনী ডাক্তারের কাছে পেয়েছে অমানবিক আচরণ। 'টুটা-ফুটা' গল্পে আছে পচে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাবনা। রাজা নামক চরিত্রের অনুভব-

> '-ওরা সমাজের ডোবার সব-নীচেকার ঘোলাটে পাঁক, আর ঐ যাঁরা দেশোদ্ধারের জন্য কোমর কাছতে কাছা খুলছেন ওঁরা ওপরকার টলটলে জল। ওদের সঙ্গে সমান পংক্তিতে ব'সে জানিয়ে দিতে হবে ওরা আমাদের সগোত্র।'
>
> (সেনগুপ্ত ১৩৫৯, পৃ. ৩৩৬)

শুধু তাই নয়, 'হাড়ি-মুচি-ডোম' (১৯৪৮) নামক একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন লেখক যেখানে ধরা পড়েছে বর্ণগত বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ও অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদ।

কল্লোল গোষ্ঠীর আরেকজন উল্লেখযোগ্য লেখক জগদীশ গুপ্ত তাঁর সাহিত্যে নিম্নবর্গের অসহায় জীবন, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাগ্য বিপর্যয় ও সমাজ থেকে ছিটকে থাকার গল্প বর্ণনা করেছেন। লঘু গুরু উপন্যাসে রয়েছে সমাজের উচ্চবর্গের জাত্যাভিমান ও ব্রাত্যজনের প্রতি তাদের হীনমন্যতার ছবি। 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পে দেখি অস্পৃশ্যতা জনিত নিম্নবর্গের উপেক্ষা। 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে উচ্চবর্গের মুখোশ খুলে দিয়েছেন লেখক।

কল্লোলের প্রভাব ও বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে 'ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়' সাহিত্য রচনায় নিজস্ব ক্ষেত্রে রচনা রীতি, ভঙ্গি, ভাষারীতি ও সর্বোপরি বিষয় চয়নে বিশেষ পরিচয় দানের মাধ্যমে নিজের পথ রচনা করেছেন। তাই তারাশঙ্করের রচনায় স্বভাবতই পেয়ে যাই কাহার, ডোম, বাগদি, সাঁওতাল, বেদে, সাপুড়ে,

ইত্যাদি সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণিদের। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে স্মরণীয়। তাঁর মতে,

> 'তারাশংকর এমন এক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে পরিচিত ধর্মাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতিকেন্দ্রিক জীবনকে ও অপরিচিত অন্ত্যজ ব্রাত্য জীবনকে ঠাঁই দিয়েছিলেন,...
>
> ...ব্রাত্য জীবনকে গভীর ও ঘনিষ্ঠ করে দেখার পথ তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।' (মুখোপাধ্যায় ১৯৭৪, পৃ.৩৪)

লক্ষণীয়, তাঁর কালিন্দী (১৯৪০), কবি (১৯৪৪), নাগিনী কন্যার কাহিনি (১৯৫২), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৫১), ডাকহরকরা (১৯৫৮) প্রভৃতি উপন্যাস এবং তারিণী মাঝি (১৩৪২), বেদেনী (১৩৪৬), নারী ও নাগিনী (১৩৪১), ব্যাঘ্রচর্ম (১৩৪৩), আখড়াইয়ের দীঘি (১৩৪০) ইত্যাদি গল্পে সমাজের অপাংক্তেয় ব্রাত্য মানুষেরা বর্তমান। 'কবি' উপন্যাসটি নিম্নবর্গের উত্থান পর্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ এখানে জন্ম সূত্রে নয় কর্মসূত্রে মানুষের পরিচয় তৈরি হয়েছে। বর্ণ বৈষম্যের অভিশাপ গ্রস্ত সমাজে নিতাই তথাকথিত অন্ত্যজ ডোম হয়েও নিজের পরিচয় সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। শুধু বর্ণ বৈষম্য নয়, একজন ডোমের কবি হওয়ার ইচ্ছেকেও মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাকে নানা অছিলায় একঘরে করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে নিতাই চলে এসেছে গ্রাম ছেড়ে। এসে যোগ দিয়েছে এক অনামী ঝুমুর দলে। কবি থেকে নিতাই নামকরা কবিয়ালে পরিণত হয়েছে। অন্ত্যজ নিতাইয়ের কবি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে মূলস্রোতে ফিরে আসা ও নিজেকে নতুন রূপে চিনতে পারার জীবনযাত্রাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, তারাশঙ্করের গল্পেও রয়েছে চিত্র। যেমন 'বেদেনী' গল্পে রাধিকা বেদেনীর হিংস্রতা ও আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি ধরা পড়েছে। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে জোবেদা সাপুড়ে, ডাকহরকরা গল্পে দিনু ডোম, ব্যঘ্রচর্ম গল্পে রতন হাড়ি, আখড়াইয়ের দীঘি গল্পে কালি বাগদি ইত্যাদি অন্ত্যজ মানুষের অবস্থান লক্ষ করা গিয়েছে।

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যেও নিম্নবর্গের সমাজচিত্র লক্ষণীয়। বিশেষ করে তাঁর ছোটোগল্পে উঠে এসেছে ডোম, হাড়ি, বাগদী, মাঝি, মোল্লা, মুচি, জেলে, কামার, কুমোর, ফাঁসুড়ে ডাকাত ইত্যাদি নিম্নবর্গ। আবার আদিবাসী সমাজের কোল সাঁওতাল মুণ্ডার মতো বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাত্য চরিত্র। ১৯৩৯ সালে রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে রয়েছে নিরন্ন নিঃস্ব মানুষের জীবনযাত্রার ছবি। বনফুলের গল্পেও সেই একই ছবি। 'বুধনী' গল্পে এক অন্ত্যজ দম্পতির করুন পরিণতি, 'ছোটোলোক' গল্পে একজন রিকশাওয়ালার আত্মমর্যাদাবোধ নিম্নবর্গের চেতনাকে স্পষ্ট করেছে। আবার 'ভক্তিভাজন' গল্পে রয়েছে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতার কাহিনি। কল্লোল গোষ্ঠীর এই ছক ভাঙার পদক্ষেপ সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন,

> ‘কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে যে জিনসটা সব চাইতে লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় তা হচ্ছে ওঁরাই প্রথম সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যে নির্যাতিত শোষিত শ্রেণীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যোচিত বিষয়ে মর্যাদা দান করেন।...বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মুখ্যত অভিজাত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল; শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্তের স্তরে তাঁর কল্পনাকে সম্প্রসারিত করলেও তার বেশি আর অগ্রসর হননি; কিন্তু শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ মিত্র প্রমুখের লেখায় সমাজের অন্ত্যেবাসী ব্রাত্যজনেরা আর অকুলীন রইল না। সেই থেকে বাংলা সাহিত্যে গণতান্ত্রিকতার বাধাবন্ধনহীন অভিযান শুরু হয়েছে।’
>
> (মুখোপাধ্যায় ১৩৬৩, পৃ. ৬১-৬২)

অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের দিকটি ধরা পড়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তার ফলস্বরূপ নিম্নবর্গের জীবন সংগ্রাম তাঁর লেখাতে গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৩৬ সালে মানিক পদ্মানদীর মাঝির নৌকা করে আমাদের নিয়ে গেলেন সরাসরি জেলেপল্লিতে। সেখানে দেখলাম জেলেদের জীবনযাপন। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই প্রান্তিক জেলে-মাঝিরা জমিদারি শোষণে শোষিত ও বঞ্চিত। জেলেরা যে পুরুষানুক্রমিকভাবে শোষিত তার প্রমাণ উপন্যাসে দেখা যায়-

> ‘পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে।... স্থানের অভাব এ জগতে নাই তবু মাথা গুজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতোল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না।...পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।’ (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৬, পৃ. ১৭-১৮)

তবে একথা ঠিক যে এখানকার জেলে-মাঝিরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দেয়নি। শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠার সুযোগ নেই এখানে। তাই তো হোসেন মিয়ার মতো শঠ, ধূর্ত লোক এই মাঝিদের ত্রাতা হয়ে উঠতে চায়।

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল, সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গকে যেভাবে বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন, জাতিগত বিভেদ, বর্ণ বৈষম্য সর্বোপরি অস্পৃশ্যতার জালে জড়িয়ে বৃত্তের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সেখানে কেবল উঠে এসেছে সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিম্নবর্গের অবস্থানের বিভিন্ন রূপ। সাহিত্য সৃজকেরা মূলত নিম্নবর্গের অভাব-অনটন বা সমস্যা সংকটের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবের কথা। এই বিশেষ প্রয়োজনগুলি যখন নিম্নবর্গ মেটাতে চেষ্টা করেছে তখনই কোনো না কোনোভাবে তারা সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা উচ্চবর্গের কাছে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত বা অপমানিত হয়েছে। এই লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমানের কথাই কেউ তাদের প্রতি সহানুভূতিবশত, কেউ প্রশ্নমনস্কভাবে, কেউ সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিতে গিয়ে, আবার কেউ বা নিম্নবর্গের মতো নতুন উপাদান সংযুক্ত করে সাহিত্যের ধারা বদলের

চেষ্টায় নিম্নবর্গকে তাঁদের লেখায় স্থান দিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে নিম্নবর্গের স্বপ্ন, উচ্চাশা, চেতনা, স্বতন্ত্র স্বর ও বিশেষ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গটি চাপা পড়ে গিয়েছে তাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের মধ্যমঞ্চায়নের যে অঘোষিত আন্দোলনটি চলছিল, তাতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই কালখণ্ডের কথাসাহিত্য আসলে নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণের প্রস্তুতি-পর্ব। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, এই প্রস্তুতি পর্বে নিম্নবর্গের যে অবস্থান উঠে এসেছে তা অনেকাংশেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক থেকে। তাছাড়া সামাজিক দিক থেকে যে সংকট তৈরি হয়েছে তাতে বিশেষভাবে রয়েছে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্য। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও উচ্চবর্গের কাছে নিম্নবর্গ অবহেলিত। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নবর্গের ওপর তৈরি হওয়া সংকটের চিত্র ধরা পড়েনি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কথাসাহিত্যে। কিন্তু সাবঅলটার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর সমালোচকেরা নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গ নির্ণায়ক একক রূপে যে ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন এবং যার ওপর ভিত্তি করে নিম্নবর্গের স্বর, চেতনা ও প্রতিবাদী সত্তাকে বিচার করেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ পর্বে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।

## ২.৪ স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থান : 'অপর' থেকে 'প্রতিপক্ষ'-এ উত্তরণ

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান বা উপস্থিতি বিষয়টি একেবারেই অভিনব বা চমকপ্রদ নয়। কারণ মোট জনসংখ্যার থেকে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্গকে বাদ দিলে যারা পড়ে থাকে সেই সাধারণ মানুষকেই গবেষক-সমালোচকেরা 'নিম্নবর্গ' বলেছেন। ফলে সাহিত্যে নিম্নবর্গের অবস্থান—বিষয়টি কোনো অভিনবত্বকে ইঙ্গিত করে না। সমাজ, অঞ্চল, প্রকৃতির মতোই নিম্নবর্গ সাহিত্যের উপাদান হিসেবেই বিবেচ্য। তবে লক্ষ করার বিষয় হল- সাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়, বা সাহিত্যে নিম্নবর্গ প্রধান রূপে স্থান পাচ্ছে না অপ্রধান অঙ্গ হিসেবে নামমাত্র রয়ে যাচ্ছে। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের বিস্তারও কিছু কম নয়। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক অনিবার্যতার কারণে নিম্নবর্গকে দেখা গিয়েছে। ফলে প্রশ্ন আসে, তাহলে আমরা কোন ধরনের কথাসাহিত্যকে আলোচনার বৃত্তে আনব? এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করে নেব প্রাবন্ধিক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের ভাষ্য।

> ‘বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য বা নিম্নবর্গ চরিত্রের দেখা উনিশ শতকেই মিলেছে এমন কথা বলার মধ্যে তেমন অভিনবত্ব নেই। দেখতে হবে চরিত্রগুলি কীভাবে এসেছে? কেবল তাদের উপস্থিতিই গুরুত্ব পেতে পারে না। সমাজ সংস্কৃতির মূল ধারার বিপরীতে তাদের সক্রিয় ও প্রতিবাদী অবস্থানটিই প্রধান আলোচ্য হওয়া উচিত।’
>
> (সরকার (সম্পা.) ২০০৭, পৃ. ১)

ফলে আমরা সেই সমস্ত কথাশিল্পকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব, যেখানে নিম্নবর্গের উপস্থিতি সক্রিয় ও প্রতিবাদী। আসলে বাংলা কথাসাহিত্যে ক্রমে নিম্নবর্গের সক্রিয় ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠার পেছনে যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব—যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, শ্রমিক আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি—যা স্বাধীনতার সমকাল ও পরবর্তীকালের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

লক্ষণীয়, প্রায় প্রতিটি ঘটনার সঙ্গেই জুড়ে আছে সমাজের নিচুতলার মানুষজন অথবা সরাসরি যুক্ত না হলেও ফল ভুগতে হয়েছে তাদেরই। ফলে নিম্নবর্গের যন্ত্রণা, জীবনযাপন ও সর্বোপরি তাদের নিজস্ব চেতনার একটি পৃথক গুরুত্ব বা মূল্য তৈরি হয়েছিল তৎকালীন সময়ে। **১৯৪৬-১৯৪৭** সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান বিভাগের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে একদিকে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস এবং অন্যদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা-উদ্বাস্তু সমস্যায় জনজীবন জেরবার ও বিপর্যস্ত হয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রক্ষমতা গিয়ে পড়ল তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের হাতে যারা সে সময় তোষণনীতির ফলে ইংরেজদের কাছাকাছি ছিল। পরাধীন দেশে যারা স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করার, তা আসলে বাস্তবায়িত হল না। সমাজের নিচুতলার মানুষগুলোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মানে হয়ে দাঁড়াল পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধারী ও পুঁজিবাদীদের অধীনতার আওতায় আসা। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর হল মাত্র, নিম্নবর্গ নতুন করে অধীনতার জালে জড়িয়ে গেল নতুনভাবে, নতুন নামে, নতুন কৌশলে। প্রশ্ন ওঠে, স্বাধীনতা পূর্ব কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ যে অবস্থানে ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যে কি তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল? হলেও তা কী ধরনের পরিবর্তন? সাহিত্যে নিম্নবর্গের উত্থানপর্বে কি কোনো বাক বদল লক্ষ করা গেল? যদি লক্ষ করা যায় তাহলে তা কীভাবে বা কোন দিক থেকে হল? এসব প্রশ্নের উত্তরই আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে খোঁজার চেষ্টা করব।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ‘ঢোঁড়াই চরিতমানস’ (১৯৫০) আমাদের সেই অনুসন্ধানের প্রথম চরণ। কারণ ঢোঁড়াই হল নিম্নবর্গের সেই প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি যাদের জীবনসংগ্রাম ও প্রতিবাদী সত্তাটি প্রমাণ করে যে- ‘নিম্নবর্গ কথা বলতে পারে’। উচ্চবর্গসৃষ্ট সমাজের কণ্টকময় পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে সেই সমাজেরই নিম্নবর্গের পথপ্রদর্শক ও কাণ্ডারি যে নিম্নবর্গকে তাদের চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ উপন্যাসটি আমাদের আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে যথাযথ। কারণ,

> ‘ভারতীয় সাহিত্যে ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ উপন্যাসটি একটি বড়ো জায়গা নিয়ে আছে। নিম্নবর্গের মানুষ বোধ হয় এমনভাবে আগে আর আসেনি। হ্যাঁ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ে সূচনা হয়েছিল সত্য, সতীনাথ তাকে দিয়েছেন মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি। আত্মার আত্মীয় করে গড়ে তুলেছেন নিম্নবর্গের মানুষকে।’ (মিত্র ২০১৭)

উপন্যাসের পটভূমি পরাধীন ভারতের বিহারের ধাঙড় ও তাৎমাটুলি অঞ্চল। ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ উপন্যাসটি নিম্নবর্গীয় সমাজের মানস ভূগোল যা সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন একদল মানুষ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বানিয়ে তোলা। যেখানে ঢোঁড়াই, রামিয়া, কোয়েরি, ধাঙড় ও তাৎমাটুলির মানুষেরা তাদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবিকাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এভাবেই নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে আসছে। নিজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের কাহিনি আলোচ্য উপন্যাসের উপজীব্য। ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ উপন্যাসে যেভাবে নিম্নবর্গীয় সমাজের উত্থানের চেষ্টা দেখান হয়েছে এবং লড়াই করেও যেভাবে ঢোঁড়াইদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে, তাতে নিম্নবর্গের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে। উপন্যাসটিতে মূলত জিরানিয়ার তাৎমাটুলির তাৎমাসমাজ, ধাঙড়টুলির ধাঙড়সমাজ ও বিস্কান্ধার কোয়েরিটোলার কোয়েরি সমাজের বর্ণনা রয়েছে। তাৎমাদের আদি জীবিকা ছিল তাঁত বোনা। কিন্তু তারা অর্থনৈতিক কারণে সেই জীবিকা ত্যাগ করে কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ বা ঘরামির কাজ করে। ধাঙড়রা ওঁরাও জাতির অন্তর্ভুক্ত। উদ্বাস্তু এই সমাজের মানুষগুলো জমিদারদের দয়ায় দল বেঁধে বসবাস করে। সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে আবার অন্য কোথাও চলে যায়। একটু ভালোভাবে থাকার জন্য এই মানুষগুলো খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে থাকে। যে কোনো কাজ করতে তারা প্রস্তুত। কোয়েরিরা মূলত বর্গাচাষি। তাৎমা, ধাঙড়দের থেকে এদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। আসলে অর্থনৈতিক ক্ষমতাই যে সব ক্ষমতার উৎস- একথা তারা তাদের নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে। গোষ্ঠী জীবনে অভ্যস্ত এই মানুষগুলোর আদিম সংস্কার ও অলৌকিকে বিশ্বাসী মনোভাব তাদের চিন্তা চেতনাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে রেখেছে। এই রকম স্থবির জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসে ঢোঁড়াই।

লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এই সব নিম্নবর্গীয় সমাজে পঞ্চায়েত নির্মিত 'পঞ্চ'র বিধানই শেষ কথা। ঢোঁড়াই এদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই দেশান্তরী হয়েছিল কারণ সমাজের উচ্চবর্গ নিয়ন্ত্রিত এই পঞ্চর বিরুদ্ধতা করেছিল সে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের শাসন শোষণ প্রক্রিয়া স্বরূপ বুঝতে পেরে ঢোঁড়াই যখন রাজনীতিতে মাথা চারা দিয়ে উঠতে থাকে তখন দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। একসময় ক্ষমতার কাছে নতজানু ঢোঁড়াইয়ের রাজনীতি থেকে বিশ্বাস উঠে যায়। কারণ ঢোঁড়াই বুঝেছিল উচ্চবর্গরা নিম্নবর্গের সরলতার সুযোগ নিয়ে ও গান্ধিজীকে রামের অবতার বানিয়ে তাদের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে এক বৃহৎ গণআন্দোলন তৈরি করতে যার দরুন ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করা যায়। তাই নিম্নবর্গের এই সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছতে দেওয়া হয় না। নিম্নবর্গকে দেখা হয় আন্দোলনের হাতিয়ার ও ভোটদাতা হিসেবে। কথাসাহিত্যে যুগ যুগ ধরে নিম্নবর্গের ব্রাত্য হয়ে আসার কাহিনি যেমন ধরা পরে তেমনই এদের হয়ে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায় ঢোঁড়াইদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইদের উত্থান ও লড়াই সফল হতে পারে না সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কারণে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬, পৃ. ১৫-৫২)

এছাড়াও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'আন্টাবাংলা' গল্পটি নীলকর সাহেব দ্বারা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত একটি ওঁরাও পরিবারের কাহিনি। বীরসা ওঁরাও এক ছুটির দিনে নীলকুঠিতে না গিয়ে নিজের ক্ষেতের কাজ করার অপরাধে নীলকর সাহেব তাকে মাথায় আটটি ইট রেখে সূর্যের দিকে মুখ করে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। বৃদ্ধ বীরসা এই শাস্তি সহ্য করতে না পেরে দিনের শেষে মারা যায়। বীরসার পুত্রবধূ নীলকর সাহেবের রক্ষিতায় পরিণত হয়। 'রথের তলে' গল্পে দেখা যায় বিহারের নট সম্প্রদায়ের পতনের কাহিনি। নাচ-গানে পারদর্শী ও নাম খ্যাতি থাকা সত্বেও তারা উচ্চশ্রেণির কাছে অবহেলিত। তাদের জীবনের দুর্দশার চিত্র চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। (হোসেন ২০০৪, পৃ. ৭০-৭১)

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'পদ্মাদীঘির বেদেনী' (১৯৪৯) উপন্যাসটি বাংলাদেশের বেদে-বেদেনীদের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কথাচিত্র। 'চরকাশেম' (১৯৫৯) উপন্যাসে দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের দৈন্যপীড়িত বাস্তব ছবির সন্ধান মেলে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাশেম দেশবিভাগকে সমর্থন করতে পারে না। সে শুধু তাদের মতো মানুষগুলোর জন্য একখণ্ড বাসস্থান দাবি করে। ফলে নিম্নবর্গের অধিকার নিয়ে সে তাদের মধ্যে এক ধরনের শ্রেণিচেতনা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু উচ্চবর্গের ক্ষমতা ও শক্তির কাছে কাশেম পারে না লড়ে যেতে।

কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের অপর থেকে প্রতিপক্ষে উত্তরণের পথে গুণময় মান্নার ‘লখীন্দর দিগার’ (১৯৫০) উপন্যাসটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কারণ ‘লখীন্দর দিগার’ কেবলমাত্র সমাজের একজন নিম্নবর্গ চরিত্র নয়, সমগ্র উপন্যাসে তার অভিজ্ঞতা যেভাবে তাকে একজন সাধারণ নিম্নবর্গ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ করেছে তাতে সমগ্র নিম্নবর্গের স্বতন্ত্রতার পরিচয়টি ধরা পড়ে। মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে থাকা কৃষি জনবসতিকে কেন্দ্র করে আখ্যানের বিস্তার। উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ভেদাভেদ এখানে স্পষ্ট। অস্পৃশ্যতা এ সমাজে অভিশাপ। উচ্চবর্গের কাছে অবহেলিত হয়ে নিম্নবর্গের মধ্যে দেখা গিয়েছে আত্মমর্যাদা বোধের উন্মেষ। তাদের মনে এ জিজ্ঞাসা দেখা গিয়েছে যে, কর্মই যদি ধর্ম হয় বা সব কর্ম যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তার, উকিল, মোক্তারদের সঙ্গে কৃষিকাজের কী তফাৎ। ফলে কৃষকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা। সেখান থেকে গড়ে উঠেছে শ্রেণি চেতনা ও প্রতিবাদ। তাই লখিন্দরের প্রতিবেশী মহেন্দ্র বলে,

> “...‘সব সওয়া যায়, কিন্তু ওরা বেশি হীন-ছিন করে, সেটা সইতে পারিনি।’ (মান্না ১৯৫৫, পৃ. ৪৬)

নিম্নবর্গের আনুগত্য লাভে উচ্চবর্গের স্বার্থ পূরণের এই অন্যায় নিয়মের কাছে নিম্নবর্গরা বরাবর বাধ্যতার শিকার। লখীন্দর এই আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তার মনে হয় কৃষকরা যতক্ষণ ঐক্যবদ্ধ আছে তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তাদের এই একতার মধ্যে প্রবেশ করেছে ধর্মবিশ্বাস। কংগ্রেসি নেতা কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশ ঠাকুর দেবতার দেশ, দেবতাকে ভালো না বাসার কারণে আমাদের দেশের আজকে এই অবস্থা। আমরা লক্ষ করেছি নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাকারীরা নিম্নবর্গের চেতনাকে বোঝার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মচিন্তাকে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। রণজিৎ গুহের মতে বীরসা মুণ্ডা সাঁওতালদের বিদ্রোহের জন্য ঐক্যবদ্ধ করলেও বিদ্রোহের আগের দিন দেবতার পূজা আরাধনার মধ্যে এই বিশ্বাসের ওপর তারা নির্ভর করেছিল যে ঠাকুরই তাদের জেতাবে। এই বিশ্বাসই তাদের ব্যর্থ করেছিল। কৃষক বিদ্রোহের প্রভাবে উপন্যাসের নিম্নবর্গকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেভাবে এর আগে কোনো উপন্যাসে তা চিত্রিত হয়নি। এখানে নিম্নবর্গের আবেগ-চিন্তা-চেতনা ও সমস্ত সামাজিক রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক স্তরে নিম্নবর্গের চেতনার সঙ্গে মিলে যায়। উপন্যাসের শেষে দেখাচ্ছেন রামায়ণ পড়া লখীন্দর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ছে। স্বার্থপর-আত্মকেন্দ্রিক সুধীর আজ কৃষক বিদ্রোহের সৈনিক। আর এখানেই সাহিত্যের আদলে নিম্নবর্গের উত্তরণ ঘটে যায়। তাছাড়া ‘জুনাপুর ষ্টীল’ (১৯৬০-১৯৬২) উপন্যাসে ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের জীবন, শ্রমিক শিবলালের রাজনৈতিক চেতনার জাগরণকে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে দেখান হয়েছে।

নকশাল আন্দোলনকে পটভূমি করে রচিত ‘শালবনি’ (১৯৭৮) উপন্যাসে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি গ্রামের দরিদ্র দুলে-মাহাতো-সাঁওতাল মানুষগুলির জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরেছেন লেখক। আবার ‘মুটে’ (১৯৮০) উপন্যাসে দেখান হয়েছে ঘাটালের কুলি অর্থাৎ ভারবহনকারীদের পেশা ও পেশাকেন্দ্রিক নানা লাঞ্ছনা, শ্রম, কষ্ট এবং সর্বোপরি তাঁদের আত্মসম্মানের ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তাঁর ‘লালমাটি’ (১৯৫১) উপন্যাসটি নিম্নবর্গীয় জীবনের দলিল স্বরূপ। ‘বৈতালিক’ উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের কথা অর্থাৎ দিনাজপুরের মুচি জনজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, তাঁর গল্পগুলির মধ্যেও নিম্নবর্গকে যে ভূমিকায় পাওয়া যায় তা উল্লেখযোগ্য। যেমন- ‘ভাঙা চশমা’, ‘সৈনিক’, ‘দুঃশাসন’, ‘বন্দুক’, ‘হাড়’, ‘কালনেমি’, ‘নীলা’, ‘বীতংস’, ‘ডিম’, ‘ভোগবতী’ ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন,

> ‘এই বিচিত্র পটভূমিতে কত বিচিত্র মানুষেরই না আবির্ভাব ঘটেছে। আসামের চা বাগানের জন্যে সাঁওতাল পরগণায় কুলি-রিক্রুটার সাধু সুন্দরলাল, পঞ্চাশের মন্বন্তরে মহানগরীর বুকে ব’সে মিন্ডানাও দ্বীপের কাটাবাটুর জংলী সর্দারের নিকট পাওয়া বলি-দেওয়া কুমারী মেয়ের মন্ত্রসিদ্ধ হাড়ের অলস-স্বপ্নে বিহ্বল মনোহরপুকুর পার্কের রায়-বাহাদুর, গোলাপাড়া হাটের মহাজন আর আড়তদার-তুলসীবনের বাঘ, নিশিকান্ত, ... দুঃশাসনেরই প্রতিনিধিস্থানীয়-কাপড়ের ব্যবসায়ী দেবীদাস, টেরাই এর প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্বে মানবশিশুর টোপ দিয়ে বাঘ শিকারের রাজকীয় ব্যসনে উল্লসিত রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন আর চৌধুরী, ... মহানগরী কিংবা মফঃস্বল-শহর, কৌলমার্গে অভিজাত ভদ্র সমাজ কিংবা ব্রাত্য ও মন্ত্রহীনের অন্ত্যজ-পল্লি, নদ-নদী-অরণ্য-পর্বত-সমাকীর্ণ বিপুল ও বিশাল পরিবেশ; যেখানেই হোক না কেন, জীবন ও জগৎকে দেখবার মতো অতন্দ্র-জাগ্রত দুটি চোখ আছে লেখকের,’
>
> (ভট্টাচার্য (সম্পা.) ১৩৬১, পৃ. ৫-৬)

বাংলাদেশের অন্যতম কথাকার আবু ইসহাক তাঁর বিখ্যাত ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’ (১৯৫৫) উপন্যাসে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উঁচু-নিচু ভেদাভেদের চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে স্থান পেয়েছে নিরন্ন দরিদ্র নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রাম। উচ্চশ্রেণি দ্বারা শোষিত নিপীড়িত মানুষগুলোর জীবন ধারা ও সংকটময় মুহূর্ত উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। ফেলে দেওয়া এঁটো খাবার কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে খেতে গিয়ে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়। একেক সময় মনে হয় এরা কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব। মানুষের মতো দেখতে কিন্তু আসলে মানুষ নয়- শিরদাঁড়া বেকে গেছে তাদের, পেটের সঙ্গে পিঠ মিশে গেছে, বুকের পাঁজরের হাড় গোনা যায় তাদের। তবু তারা যেন সভ্যতার কাণ্ডারি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। সমগ্র উপন্যাসটি বাংলাদেশের সমাজের প্রান্তে থাকা মুসলিম জনজীবনের জলছবি। ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ (১৯৮৬) উপন্যাসটি দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের একবছরের বেশি সময়কালের প্রেক্ষাপটে খাদ্য, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের দুর্দশা ও কেন্দ্রীয় চরিত্র ফজলের জীবন সংগ্রাম তথা পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবন পরিক্রমার আখ্যান। (ইকবাল ২০১৪, পৃ.১২১)

মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১) উপন্যাসটি রচিত হয়েছে মানুষ ও মাটির প্রতি ভালোবাসার টানে। জলজঙ্গলে বসবাসকারী মানুষগুলোর জীবনে প্রাকৃতিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে উঠে এসেছে তাদের সংস্কৃতি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিকূল পরিবেশ। সুন্দরবন অঞ্চল সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু মানুষের আর্থিক দিক থেকে সবল হওয়ার কারণে তারা সেখানকার জমিদারে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে সেখানে তৈরি হয়েছে সামন্ততন্ত্র। যে মানুষগুলো নিজেদের শ্রম দিয়ে জঙ্গলকে বাসযোগ্য করে তুলল তারাই সেখানে ব্রাত্য হিসেবে থেকে যায়। শুধু 'জলজঙ্গল' নয় তাঁর 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) উপন্যাসেও উঠে এসেছে প্রায় একই প্রসঙ্গ।

মনোজ বসুর গল্পগুলির ভেতরেও রয়েছে নিম্নবর্গের ভূমিকা। তাঁর 'পৃথিবী কাদের' গল্পে অত্যাচারিত কৃষক পরিবারের দুর্দশার চিত্র বিবৃত হয়েছে। নটবর মন্ডল কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কিছু জানে না। দারিদ্র্যের শিকার এই মানুষটি গত তিন বছরের খাজনা জমিদারকে দিতে না পারলে নটবরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু জমি থেকে সে যেতে চায় না। জমিদার তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে তারা রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। জমিদারের অত্যাচারে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবার সম্পূর্ন ব্রাত্য হয়ে পড়ে। 'ধানবনের গান' গল্পটি এক ব্যতিক্রমী বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কারণ এখানে ব্রাত্য-নিম্নবর্গের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অত্যাচার, বঞ্চনার কথা তুলে ধরা হয়নি। বরং এর উল্টো দিকে নিম্নবর্গের জীবনে মিলন-মধুর-আনন্দ উল্লাসের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। (হোসেন ২০০৪, পৃ. ৭৩)

বর্তমান বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাশিল্পী শহীদুল্লাহ কায়সার তার বিখ্যাত 'সারেং বৌ' (১৯৬২) ও 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) উপন্যাস দুটিতে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র এলাকাকে কেন্দ্র করে সমাজ ইতিহাসের চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বামনছাড়ি গ্রামের লুন্দর শেখ একজন অত্যাচারী আগ্রাসী জমিদার। যার দ্বারা গ্রামের অধিকাংশ নারী লালসার শিকার হয়েছে। 'সংশপ্তক' এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাকুলিয়া ও তালতলী গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো তাদের শোষণ নির্যাতন ও বাঁচার সংগ্রাম প্রাণবন্ত ভাষায় উপন্যাসের রূপ পেয়েছে। বিশেষ করে ফেলু মিঞা ও রমজানের চরিত্রটি এখানে সামন্ততন্ত্র পুঁজিবাদের

প্রতীক হয়ে উঠেছে। আসলে লেখক সমাজমুক্তির বিষয়টি সাধারণ মানুষের ঐক্যশক্তির ভেতর দিয়ে আমাদের শোনাতে চেয়েছেন। (ইকবাল ২০১৪, পৃ. ১২৫)

প্রফুল্ল রায়ও তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলির চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর 'স্বপ্নের ট্রেন' গল্পে আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত বাঙালির দুঃখ দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। 'মাঝি' গল্পে খেটেখাওয়া মাঝি ফজল মিঞা শোষণকারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আবার 'চর' গল্পে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে কেমন করে পশুশক্তি ও শোষক সত্তার জাগরণ হয়। 'বাঘ' গল্পে সঙসাজা শিল্পী ঘুনুরামের জীবনের আত্মমর্যাদা ও প্রতিবাদী চেতনার গল্প। সে প্রতিবছর মহারাষ্ট্রে গণেশ উৎসবে বাঘ সেজে সকলকে খেলা দেখায়, আনন্দ দেয়। কিন্তু নোনপুরার উত্তরে একটি গ্রামে শম্ভা বেদে জ্যান্ত বাঘের খেলা দেখালে ঘুনুরামের খেলা আর কেউ দেখতে চায় না। শিল্পীর মান বজায় রাখার জন্য সে নকল বাঘ সেজে আসল বাঘের সঙ্গে লড়াই করে নিজের প্রাণ হারিয়েছে।

অন্ত্যজ মানুষের নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার ছবি তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিশেষভাবে প্রকটিত। যেমন- তাঁর পূর্বপার্বতী (১৯৫৭) উপন্যাসে ভারতের পূর্ব সীমান্তে নাগাল্যান্ডের পার্বত্য জাতির জীবনচর্যা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এরা কীভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল তার তথ্যভিত্তিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে যেখানে একই সঙ্গে এই নিম্নবর্গ মানুষগুলোর প্রতি শোষণ বঞ্চনা ও তাদের রাজনৈতিক চেতনার কথা উঠে এসেছে। 'সিন্ধুপারের পাখি' (১৯৫৯) আলোচিত হয়েছে আন্দামান দ্বীপে জেলে বন্দী কয়েদিদের বঞ্চিত জীবনের আলেখ্য। বন্দী জীবনের নানা নিষ্ঠুর আঘাত বঞ্চনা নিপীড়নের কথা উপন্যাসে নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে রচিত তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস 'কেয়া পাতার নৌকো'-তে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবন চিত্রিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রভাব ও আর্থিক রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে বাঙালি জীবনে যে সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে তার বিবরণ উপন্যাসের উপজীব্য। 'আকাশের নীচে মানুষ' (১৯৮১) উপন্যাসে নিম্নশ্রেণির শোষণ-বঞ্চনার কাহিনি উঠে এসেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধম্মা একজন বেগারখাটা ভূমিদাস। প্রজাপীড়ক অত্যাচারী ভূস্বামী রঘুনাথ ভূমিদাসদের অন্যায়ভাবে খাটিয়ে মুনাফা লাভ করে। পুরুষানুক্রমে বিক্রিত ভূমিদাসদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা গড়ে তোলে গবাদোসাদ। প্রতিবাদের চেহারা বীভৎস হলেও ক্ষমতাশালী ভূস্বামী রঘুনাথ তা স্তিমিত করে দেয়।

সাহিত্যে নিম্নবর্গের রূপকার যদি নিজেই নিম্নবর্গের একজন হয়ে থাকেন তাহলে নিম্নবর্গের নির্মাণ যে অনেকটা বাস্তবসম্মত সমাজসত্যকে বয়ে আনে তা বলাই বাহুল্য। কারণ অভিজ্ঞতা সবসময়ই প্রাণবন্ত দলিল হিসেবে কাজ করে। আমরা এখানে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথা বলতে চাইছি। আমরা জানি

তিনি একজন মালো সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ। নিজ শিকড়ের টানেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসটি। যেখানে নদী হয়ে উঠেছে মালোদের উপার্জনের মূল চালিকা শক্তি। তারা তিতাসের বুক থেকে আহরণ করেছে মীনশস্য। ফলে তিতাসের বুকে চর নামলে তাদের জীবনেও নেমে আসে বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের সময় পেটের দায়ে তারা জীবিকা বদল করে। তাই বাসন্তীকে দেখা যায় সাররাত সুতো কাটতে, জয়চন্দ্রের বউ ভিক্ষা করতে বের হয়, বনমালী মাছের পোনা বিক্রির কাজ নেয়, কেউ বা বড়োলোকদের নৌকায় কাজ নেয়। উপন্যাসে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ভেদাভেদ তো রয়েছেই, কিন্তু নিম্নবর্গের মধ্যেও উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদ দেখা গিয়েছে যা নিম্নবর্গের ইতিহাসে লক্ষণীয়। কালোবরণ চরিত্রটি নিজেকে সুবলের চাইতে উচ্চস্তরের মানুষ ভেবেছে কারণ সে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও তার নিজের নৌকা রয়েছে, আর সেই নৌকার কর্মচারী সুবল। ফলে কালোবরণ সুবলকে চালনা করে। কালোবরণের আদেশ মানতে গিয়ে নৌকার তলে প্রাণ হারাতে হয় সুবলকে। সুবলের বউকে হতে হয় বিধবা। আর্থিক ক্ষমতার কারণেই কৃষকরা জেলেদের থেকে নিজেদের উচ্চস্তরের ভাবে। তারা নদীর চর দখল করতে চায়। অর্থহীন-ক্ষমতাহীন মাঝি জেলেরা তিতাসকে হাতছাড়া করতে চায় না। রামপ্রসাদ মাঝির মধ্যে আমরা একপ্রকার প্রতিবাদী সত্তা লক্ষ করেছি। সে মাঝিদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা গড়ে তুলতে চায় এই বলে যে –তিতাসে জল থাকুক আর নাই থাকুক তা মাঝিদেরই থাকবে। মালোদের সে এককাট্টা হয়ে লাঠি ধরতে বলে। কারণ রামপ্রসাদ জানে যেখানে ক্ষমতার ও অর্থের অভাব, সেখানে একতাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়ো ক্ষমতা ও প্রতিরোধ। কিন্তু মালোদের মধ্যে সেই শ্রেণিচেতনা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় সে। কিন্তু সে হার মানেনি। নিজেই ভাইদের নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে ভীরে যায়। কৃষকদের ক্ষমতা ও বলের সামনে সে টিকতে পারে না। জীবন দিতে হয় তাকে। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ক্ষমতার সামনে নিম্নবর্গরা বরাবরই ভীত। সামান্য প্রতিবাদী চেতনা তাদের থাকলেও তা সার্থকভাবে নিজেদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়েছ বারবার। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই সত্যই তার 'ক্যান দ্য সাবঅলটার্ন স্পিক' প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের আরো দুজন নিম্নবর্গ চরিত্র বন্দে আলী ও করম আলী তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে তাদের ন্যুনতম শখ ও ইচ্ছেকে অবদমন করে। 'অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রির'- মতো কেটে যায় তাদের জীবন। তিতাস পারের মালোদের জীবনের শিকড় গেঁথে রয়েছে এই নিম্নবর্গীয় জীবনের গভীরেই। (ভট্টাচার্য ২০১০, পৃ. ২৪২-৪৫) তাই উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পরতেই লক্ষণীয়, উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের শোষণের চিত্রটি। রেল কোম্পানি যখন ভৈরবঘাটের মালোদের জমি দখল করে নেয় তখন তাদের মধ্যে

কোনো প্রতিবাদ জন্ম নেয়নি। কিন্তু মালোরা তাদের সমাজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেদের বিদ্রোহী মনকে জাগিয়ে তোলে। কারণ,

> '... নিম্নবর্গরা কেবল মার খাবে তা নয়, তারাও হবে প্রতিবাদী, জানান দেবে নিজেদের বিদ্রোহী সত্তার। মালোরা তাদের সংস্কৃতি রক্ষার দৃঢ় চেতনার পরিচয় দেয়। তাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির মূলটুকু যাত্রার দল কঠোর কুঠারাঘাতে কেটে দিলে তাতে ভাঙন ধরে, ঠেকানোর জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠে মোহন, বাসন্তী এবং অন্যান্যরা; যদিও তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থতার মুখ দেখে।' (ঠাকুর (সম্পা.) ২০১৩, পৃ. ১৩৩)

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (১৯৫৮) উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছে আধুনিককালের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা ও তার ফলে নিম্নবর্গের সমস্যা ও সংকটের বর্ণনা। ভূমিপ্রথা, চাষিদের প্রতি অন্যায় অবিচার ও উচ্চবর্গের পোষা পুলিশ প্রশাসন এই নিম্নবর্গের ওপর জুলুম কায়েম করে। এই একমুখী শাসন-শোষণ ও অনিরাপদ সমাজে যুঝতে যুঝতে নিম্নবর্গের মধ্যে প্রতিবাদী সত্তাটুকুও নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাঁর ছোটোগল্পগুলিতেও রয়েছে নিম্নবর্গের অবস্থানের চিত্র। 'গোত্রান্তর' গল্পে সঞ্জয় চরিত্রটি মধ্যবিত্ত ও স্বার্থপর। সঞ্জয়ের দৃষ্টিতে নিম্নবর্গ মূল্যহীন। কিন্তু নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিম্নবর্গের নারী নেনিয়াকে সে কিনে নেয় ভোগের জন্য। আবার শ্রমজীবী মানুষদের মিল বিরোধী আন্দোলনে সে যোগ দেয় তাঁর আত্মোন্নতির জন্য। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে রয়েছে উচ্চবর্গের নিম্নবর্গের নারীকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগানো এবং তাকে ভোগ করার বাস্তব চিত্র। অর্থাৎ অর্থ দিয়ে সমস্ত কিছু কিনে নেওয়ার উচ্চবর্গীয় মানসিকতার মুখোশ খুলে ফেলা হয় এখানে। উঁচুশ্রেণি যখন ধনিয়া নামক এক নারীর কাছ থেকে মাতৃত্ব ও দেহ কিনে নেয় তখন সে আর অস্পৃশ্য থাকে না। কিন্তু যখন তারা সামাজিক স্বীকৃতি দাবি করে তখন তারা হয়ে যায় অস্পৃশ্য। মধ্যবিত্তের এই নিম্ন ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতা এবং অর্থের দাম্ভিকতা নিম্নবর্গের চেতনায় যে আঘাত হানে তার সত্যতা তুলে ধরেছেন লেখক। (ভট্টাচার্য ১৩৫৬, পৃ. ৫০-৭১)

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অমিয়ভূষণ মজুমদার একজন দিকপাল লেখক। তাঁর সৃজিত কথাসাহিত্যে অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল মানুষেরা। উত্তরবঙ্গের মানুষ হিসেবে সেই অঞ্চলের আদিবাসী ও তথাকথিত অনগ্রসর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা, সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ও রাজনীতিকে তিনি কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে আমরা প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে উঠে আসতে দেখেছি। ১৯৫৫ সালে 'নীল ভূঁইয়া' উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন তিনি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রান্তীয় অনগ্রসর তথা নিম্নবর্গ-প্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৮৮), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১), 'সোদাল' (১৯৮৭), 'বিনদনি' (১৯৮৫), 'মাকচক হরিণ' (১৯৯১), 'হলং মানসাই উপকথা' (১৯৮৬) প্রভৃতি। তাঁর

উপন্যাসের বিষয় ও পটভূমির অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দেখা গিয়েছে - যারা অরণ্যচারী, শিকারি, অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যসমাজ থেকে শতহস্ত দূরের মানুষ। 'মহিষকুড়ার উপকথা' ও 'হলং মানসাই উপকথা' উপন্যাসে অরণ্যঘেরা অরণ্যচারী মানুষের কথা তুলে ধরে তাদের জীবন সত্যকে আখ্যানের আড়ালে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা 'কালিন্দী' উপন্যাস এর মতোই উত্তরবঙ্গের মহিষকুড়া ও হলং মানসাই নদীর তীরবর্তী অরণ্যবাসী মানুষদের নিয়ে রচিত হয়েছে উপন্যাস দুটি। যে সভ্যসমাজ, এই অরণ্যচারী মানুষদের অসভ্য নিম্নশ্রেণি বলে ব্রাত্য করে রেখেছিল অমিয়ভূষণ তাদের জীবনের অব্যক্ত সত্যগুলোকে আমাদের সামনে ব্যক্ত করেছেন। তার 'সোঁদাল', 'মাকচক হরিণ' ও 'বিনদনি' উপন্যাসগুলি উত্তরবঙ্গের হারিয়ে যাওয়া রাভা জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতির বয়ান। উপন্যাসে রয়েছে রাভা জনগোষ্ঠীর উৎস, সমাজ-সংস্কার-জীবনযাপন। সমাজের মূল স্রোত থেকে ধীরে ধীরে রাভারা কীভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের অস্তিত্বের পেছনে কীভাবে একটি প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হচ্ছে- এইসব তথ্য ও সত্যের মিশেলে আলোচ্য আখ্যানগুলি রচনা করেছেন তিনি। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে পুঁজিবাদী যান্ত্রিক সভ্যতার করালগ্রাসে অরণ্যচারী আদিবাসীদের  সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে দেখান হয়েছে। লক্ষণীয়, বন্য মহিষকে আদিবাসীরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত, মহিষ তাদের শ্রম ও শক্তির প্রতীক। কিন্তু দেশকাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহিষের ব্যবহার অবলুপ্ত হতে থাকল। মহিষের স্থান দখল করল যান্ত্রিক সভ্যতার বড়ো বড়ো লরি। পশু শক্তির বদলে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ যেমন বিঘ্নিত হয়েছে তেমনি অরণ্য জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ সভ্যতাও বিপর্যস্ত হয়েছে। লেখক কৌশলে লরিকে শোষণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে যন্ত্রসভ্যতার কুফলটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

গল্পকার অমিয়ভূষণ তাঁর গল্পগুলির মধ্য দিয়েও তথাকথিত প্রান্তীয় নিম্নবর্গকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্প ভান্ডারে এক'শটিরও বেশি গল্প রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-  'দুলহারিণদের উপকথা', 'সাদা মাকড়সা', 'অরণ্যে রোদন', 'একটি শিকার কাহিনি', 'তাঁতীবউ', 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া', 'একটি খামারের গল্প', 'মাকচক' ইত্যাদি। এইসব গল্পে উঠে এসেছে আদিবাসী সমাজের স্বভাব-সংস্কৃতি সভ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বোধ, গ্রামীণ সভ্যতার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভাঙ্গন, দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল মানুষদের নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি। 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী পাহাড়ি মানুষের কথা স্থান পেয়েছে। 'তাঁতীবউ' গল্পে স্বামী গোকুলের স্বপ্ন তার একটি ফুটফুটে সুস্থ সুন্দর ছেলে। কিন্তু তার এই স্বপ্ন পূরণে গোকুল নিজেই ব্যর্থ, কোনো তাবিজ কবজে

কাজ না হলে গোকুলের ইচ্ছায় তাঁতি বউকে যেতে হয়েছে ফকিরের মন্ত্র নিতে, অপুষ্ট অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে তাঁতি দম্পতির জীবন বেদনা গল্পে চিত্রিত হয়েছে। 'মাকচক' গল্পে উঠে এসেছে রাভা জনজাতির অন্তরজীবন। 'সাদা মাকড়সা' ও 'পায়রার খোপ' গল্পে দেখা যায় দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল মানুষদের উদ্বাস্তু জীবনের মর্মান্তিক করুণ চিত্র। (মুখোপাধ্যায় ১৯৯৪, পৃ. ১২৫-২৬)

ননী ভৌমিকের কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদান না থাকলেও তাঁর গল্পগুলি আমাদের সমাজের তল থেকে দেখা ইতিহাসকে সামনে এনে দাঁড় করায়। সমাজের নিম্নস্তরীয় মানুষগুলির উচ্চস্তরীয় ব্যাখ্যা ও চিত্র তুলে আনতে লেখকের বিশিষ্টতা রয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ননী ভৌমিকের গল্পগুলি এককথায় নিম্নবর্গীয় জীবনের দর্পণ। 'একটি দিন-১৯৪৪' গল্পে ধরা পড়েছে বাংলার জনজীবনের ছবি- যেখানে বিড়ি শ্রমিক ইয়াসিন, ফটোগ্রাফার শকুন্তলা, কম্পোজিটর নীলমণি, চরিত্রের জীবনসংগ্রাম এবং সমগ্র বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জাগরণের ছবি উঠে এসেছে। 'খুনির ছেলে' গল্পে রয়েছে রহিম নামক ঘোড়ার গাড়ি চালকের কাহিনি। 'কেলে পাথরী' গল্পে দেখা যায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ক্ষুধার যন্ত্রণার রূপ। 'হটাবাহার' গল্পে রয়েছে চা বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা ও শোষণের কাহিনি। বিভিন্ন পত্রিকায় কর্মরত ননী ভৌমিক উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষুধা হল এমন এক প্রবৃত্তি যা মানব জীবনের অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। তাঁর গল্পের মূলসুর হল- প্রয়োজনে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করে।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) উপন্যাসটি বাংলা নদীভিত্তিক উপন্যাসের অন্যতম। লেখক এখানে মাছমারা অর্থাৎ জেলেসম্প্রদায়ের জলছবি এঁকেছেন। শুধু জেলেরা নয়, চুনুরী, ও রাজবংশীদের কথাও এখানে উঠে এসেছে। প্রধানত মাছমারা, মালো সম্প্রদায়ের জীবন বৃত্তান্তই এই উপন্যাসের উপজীব্য। মানিক ও অদ্বৈতের মতো লেখক 'গঙ্গা' উপন্যাসে মূলত মাছমারা জেলেদের জীবন সংগ্রাম, জীবন ধারণ ও গঙ্গা বক্ষে মীন আহরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাজের অঙ্গ হিসেবে এখানেও দেখা দিয়েছে ধনতন্ত্রের প্রভাব। উপন্যাসের নায়ক বিলাস এবং তার সহকারী পাচু। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত তাদের জীবন সংগ্রাম নিম্নবর্গের যে সাহসিকতা ও অকুতোভয়ের প্রমাণ দিয়েছে তাতে নিম্নবর্গের ইতিহাসের এক অনালোকিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন ব্রাত্য অঞ্চল, শিল্পাঞ্চলের বস্তি, নিম্নবর্গীয় মানুষদের অমার্জিত অঞ্চলে। 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭) উপন্যাসটিও সেরকমই। ১৯৬৭ সালে গড়ে ওঠা শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল কৃষকদের

শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। উপন্যাসে তাই গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার চেতনা উঠে এসেছে। উপন্যাসের নায়ক রুহিতন কুরমি একজন আদিবাসী নিম্নবর্গ। আট বছর বয়স থেকেই জীবন সংগ্রাম করে চলেছে সে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিল চা বাগানের কর্মী, কিন্তু তাঁর পিতা পশুপতি কুরমি সে পেশা থেকে সরে এসে জমির স্বপ্ন দেখেছিল। রুহিতনের ভাষায় জোতদার, জমিদার, মালিকরা ইচ্ছে করলেই তাঁর বাবাকে গিলে ফেলতে পারত কারণ তাদের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা। রুহিতনের কথায় উচ্চবর্গের নানা শোষণ পীড়নের কথা বাস্তব কঠিন ভাষায় উঠে এসেছে। রুহিতনের বিদ্রোহী মানসিকতা গড়ে উঠেছে বাবার মুখে শোনা নানা উৎপীড়ন অন্যায়ের কাহিনি শুনে। সে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধর্মঘট ও আন্দোলনে শামিল হয়। কলকাতায় এসে কৃষকদের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে সে, জেল খেটেছে এবং একবুক স্বপ্ন সফল করার অঙ্গীকারবদ্ধ এই যুবক লড়ে যায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত। কিন্তু রুহিতনের এই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। জেলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে একপ্রকার পঙ্গু হয়ে যায়। পরিবার পরিজন বিচ্ছিন্ন এই মানুষটি শেষে আশাহত সৈনিকে পরিণত হয় এবং আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের লড়াইকে থামিয়ে দেয়। এইভাবেই নিম্নবর্গ তাদের প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে এবং সেখানেও দেখা গিয়েছে বৃহৎ আকারে গড়ে ওঠা আন্দোলন বা বিদ্রোহগুলি কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ক্ষমতার কাছে। এক্ষেত্রে ইতিহাস যে তথ্য পরিবেশন করেছে সাহিত্যেও এর অন্যথা হয়নি। (মুখোপাধ্যায় ১৯৭৪, পৃ. ২৭৯-২৮১) তাঁর ছোটোগল্পগুলিতেও অসহায়, সর্বহারা নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্গের পরিচয় উঠে এসেছে। পাড়ি, শানা বাউরির কথকতা ইত্যাদি। সমরেশ বসু তাঁর ছোটোগল্পগুলির মধ্য দিয়েও নিম্নবর্গের আখ্যান নির্মাণ করেছেন। সেখানে আছে প্রান্তিক মানুষের প্রেম-দ্বন্দ্ব-ষড়যন্ত্র-দাম্পত্য-দারিদ্র্য-পীড়ন-বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র। ‘শেষ মেলায়’ ও ‘গুণিন’ গল্প দুটি নিম্নবর্গের প্রেমপিপাসায় উদগ্র হিংস্রতা ও কামনা-বাসনার কাহিনি। ‘অকাল বৃষ্টি’ গল্পে দেখা যায়, সিধু নামক এক ডোম চরিত্রকে। সে সারাদিন মরা পোড়ায় ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। ডোম ও বাউরিদের নিয়ে লেখা আরেকটি গল্প হল ‘খিঁচাকবলা’। খিঁচাকবলা একজন ডোম সন্তান। দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচতে পকেটমারি করে সে জীবন চালায়। একদিন কোনো এক ভিড় বাসে সে একজনের পকেট মেরে ১২৫ টাকা পায়। এই ঘটনা দেখে ফেলে পেরকেশ বাউরি। সে সেই টাকার অর্ধেক দাবি করে। কিন্তু খিঁচাকবলা রাজি হয় না। ঘটনাচক্রেই সেদিন রাস্তায় একসিডেন্টে পেরকেশ বাউরির মৃত্যু হয়। ‘শানা বাউরির কথকতা’-গল্পে শানা বাউরি নামক এক অসহায় লাঞ্ছিত পুরুষের কাহিনি। তার স্ত্রী উচ্চবংশীয় কামুক পুরুষদের নির্লজ্জ কামনার শিকার হয়ে বারে বারে ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়।

শানা জীবিকা সুত্রে বাইরে থাকে বলে এত খবর অজানা থাকে তার। উচ্চবর্গীয়দের কামনার শিকার হয়ে শানা বাউরির মতো একজন অন্ত্যজ মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। আবার 'প্রবর্তন' গল্পে ব্রাত্য মানুষের উল্টোচিত্র লক্ষিত হয়। গল্পে এক নাপিত পরিবারে অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তাদের পরিবারের সুখ-শান্তি-আনন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'পাড়ি' গল্পে দেখান হয়েছে নট জাতের এক দম্পতির জীবন সংগ্রামের কাহিনি। তারা গ্রামের এক বাবু সাহেবের বাড়িতে শুকর পালনের কাজ করে। লংকু সর্দার তাদের বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে শহরে আনে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তারা বেকার হয়ে পড়ে। অর্থাভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণা চেপে রেখে দিন কাটে তাদের। একদিন গঙ্গার ধারে এক শুকর ব্যবসায়ী শুকর প্রতি এক আনার বিনিময়ে শুকরগুলি গঙ্গা পার করে দিতে বললে তারা পেট ভরে ভাত খেতে পাওয়ার আশায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুকরগুলিকে পার করে দেয়। শুকরগুলিকে পার করা যেন তাদের কাছে জীবনতরী পার করার মতো। তারা সফল হয়, ভরপেট ভাত খেয়ে তারা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবীর রচনাগুলি নিম্নবর্গের উত্থানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যে মূলত আমরা নিম্নবর্গকে অপর থেকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে দেখি। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গকে নিয়ে একটি গণবৃত্ত সৃষ্টি করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে মহাশ্বেতা দেবীর মতো নিম্নবর্গকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহের মূলস্রোতে আর কেউ আলোচনা করেননি। তাইতো তাঁর কথাসাহিত্যে লোধা-চুয়াড়-সাঁওতাল-শবর-হরিজনদের আনাগোনা। নিম্নবর্গের ইতিহাসের মতোই তিনি তাঁর লেখায় তেভাগা-নকশাল-কোল-সাঁওতাল- চুয়ার বিদ্রোহকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহকে পটভূমি করে রচনা করেছেন 'নটী' (১৯৫৭) উপন্যাসটি। যেখানে ইংরেজদের সঙ্গে গরিব চাষিদের সম্পর্ক ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে চাষীদের লাঙল ছেড়ে অস্ত্র তুলে নেওয়ার চিত্র উঠে এসেছে। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের মতোই মহাশ্বেতা সৃষ্টি করেছেন 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞিুর জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৬) উপন্যাসটি। 'কবি'- উপন্যাসে রয়েছে ডোম নিতাইয়ের কবি হয়ে ওঠার কাহিনি, অন্যদিকে আলোচ্য উপন্যাসটি কবি কলহনের আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনি। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নিতাই তার সামাজিক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠে একজন কবি হয়ে উঠতে পেরেছিল, কিন্তু চুয়াড় যুবক কলহন তা পারেনি- কবি হয়ে ওঠার ইচ্ছে সমাজের কাছে অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ফলে সমাজ তাকে এই অপরাধের দণ্ড হিসেবে হাতির পায়ের তলে পিষ্ট করেছে। রাজা গর্গবল্লভ চুয়াড় কলহনের কবি হিসেবে উত্থানকে মেনে নিতে পারেনি। কারণ একজন নিম্নবর্গ শিক্ষিত বা প্রতিষ্ঠিত হলে তার দ্বারা সমগ্র চুয়াড় সমাজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, উজ্জীবিত হবে। ফলে নিম্নবর্গের

উত্থানকে স্তিমিত করে দেওয়ার জন্য কলহনকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিহারের সামাজিক প্রেক্ষিতে 'মাস্টারসাব'(১৯৭২) উপন্যাসে দলিতশ্রেণির প্রতি মহাজনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও শোষণ-নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) উপন্যাসটিতে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে বিদ্রোহের কাহিনি। জমির অধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত মুন্ডারা বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে যেভাবে একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার ঐতিহাসিক চিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে। কিন্তু একটা সময় ইংরেজদের রাজনীতির শিকার হয়ে বীরসাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ঠিক একইভাবে 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৭৮) উপন্যাসে বসাই লক্ষ করে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষেতমজুর ও সাঁওতালরা সমাজের উচ্চবর্গ দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। লেখক বসাইকে সাঁওতালদের প্রতিনিধি ও শোষিত কৃষকদের প্রতিভূ রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বসাইকেও একইভাবে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'অগ্নিগর্ভ' (১৯৭৮) উপন্যাসেও উচ্চবর্গ দ্বারা সমাজের সাধারণ মানুষদের শোষণের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখিকা তাই জানিয়েছেন,

> 'শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখার প্রধান ভূমিকায়। ... স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী ,কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।'
>
> (দেবী ১৯৭৮, পৃ. আট)

'চট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' (১৯৮০) উপন্যাসটি একজন মানুষ ও তার সমাজ আন্দোলন এর কাহিনি। আলোচ্য উপন্যাসে দেখান হয়েছে, শাসকশ্রেণির শোষণ কীভাবে মুন্ডা সম্প্রদায়কে পদতলে পিষ্ট করে রেখেছে। এর প্রতিবাদ স্বরূপ চট্টি মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডাদের বিদ্রোহ ও বীরত্বের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে ব্রাত্য মুন্ডা সম্প্রদায়কে যুক্ত করার জন্য মহাশ্বেতা দেবী তাদের এভাবে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। 'ব্যাধখন্ড' (১৯৯৭) উপন্যাসে দেখি সমাজের নিম্নবর্গ ব্যাধ ও শবর জীবনের ধারাভাষ্য । অরণ্য নির্ভর ব্যাধ ও শবর জনগোষ্ঠী কীভাবে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার হয়েছিল- সেই কাহিনি আলোচ্য উপন্যাসের উপজীব্য। 'সরসতীয়া' (১৯৭৯) উপন্যাসে দেখা যায় নিম্নবর্গীয় নারীরা জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য নিম্নমানের কাজ করতে বাধ্য হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই নারীরা যে লিঙ্গশোষণের শিকার হয়েছে তার মর্মান্তিক চিত্র রয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। এই অবহেলিত ও অবমানিত নারীদের একজন হল লছমি। যে একই সঙ্গে পুরুষের কামনাকে সন্তুষ্ট করে এবং সমাজের অবমানিতা নারীদের সাহায্য করার সংকল্প করে। এছাড়াও মহাশ্বেতা দেবীর যে সমস্ত উপন্যাসে প্রান্তিক, অন্ত্যজ ও অনগ্রসর শ্রেণির বয়ান রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল- 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৬), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮১), টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৯০) প্রভৃতি। (রহমান ২০১৫, পৃ. ৯৭-১২৭)

তবে শুধু উপন্যাসেই নয়, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পগুলিতেও সমাজের সাধারণ, নিরন্ন, শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের উঠে আসতে দেখি। যেমন- 'জাতুধান', 'বান', 'ভাত', 'জন্মতিথি', 'রাক্ষস' প্রভৃতি গল্পে নিরন্ন মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা প্রকাশিত হয়েছে। 'স্তনদায়িনী' গল্পটি মহাশ্বেতা দেবীর একটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। স্তন্যদায়িনী- যশোদা ধনী পরিবারের শিশুদের স্তনদান করত- সে অর্থে যশোদা সেই শিশুদের দুধ-মা। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার মারাত্মক কর্কটরোগ ধরা পড়ে। যশোদার কর্কটরোগ যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে গল্পে। বিশ্বসংসারকে যে দুধ দিয়েছে তার মৃত্যু হয়েছে নির্জনে-নিঃশব্দে। দাহ করার একজন মানুষও পাওয়া যায়নি। শেষে ডোমই তাকে দাহ করেছে। স্বার্থপর সমাজের বীভৎস রূপ গল্পটির মধ্যে ধরা পড়েছে। 'ভাত' গল্পে রয়েছে উচ্ছব চরিত্রের চিরক্ষুধার পরিচয়। বন্যায় স্ত্রী সন্তানকে হারিয়ে উন্মাদপ্রায় উচ্ছব শহরে এসে বড়োবাড়িতে কাজ পায়। কিন্তু সেই সকাল থেকে খেটে যাওয়া উচ্ছবকে খাওয়ার কথা কেউ বলে না। ভাতের ফ্যানের গন্ধে খিদে আরো মাথাচারা দিয়ে ওঠে তার। কিন্তু সেই সময় মৃতপ্রায় বুড়োকর্তার মৃত্যু হলে অশৌচ সংস্কার পালনে বাসিনী সমস্ত রন্ধন ফেলে দিতে যায়। ভাত ফেলে দেওয়া দেখে উচ্ছবের মাথা ঠিক থাকে না। সে বাসিনীর হাত থেকে ভাত ভরা পিতলের ডেকচি নিয়ে স্টেশনের মাঠের দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু পিতলের বাসন চুরি করার মিথ্যা অপবাদে তার পেছনে পুলিশ ধাওয়া করে। পুলিশ তাকে ধরতে গিয়ে দেখে উচ্ছব দুহাতে মুঠো মুঠো ভাত গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন ভাতের জন্য একজন নিরন্ন নিম্নবর্গের কাছে সমাজবোধ আশা করা বৃথা। অন্ন, ক্ষুধা, আশ্রয় ও পোশাকের প্রয়োজন বা দাবিকে অন্যায় বা চুরির অপবাদ দেওয়া হয়েছে। নিম্নবর্গের এই করুণ আখ্যান এর থেকে আর কী হতে পারে। আসলে মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টিকর্ম সময়ের দলিলিকরণে বিশ্বাসী। তাঁর গল্পগুলি

> '... জাতপাত, জমিজঙ্গলের অধিকার, এবং সর্বোপরি ক্ষমতাসীন শ্রেণীর ক্ষমতার আস্ফালনের তথা কায়েম রাখার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণের ক্রমান্বয়িক ইতিহাস।' (দেবী ১৯৯৩, পৃ.vii)

একশ্রেণির মানুষের তৈরি সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে আর একশ্রেণির দ্বন্দ্বের সত্য উদঘাটন করা লেখকের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একশ্রেণি সুবিধাভোগী এবং আরেক শ্রেণি শোষিত-বঞ্চিত। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য তাই প্রতিবাদের আখ্যান, ক্রুদ্ধ সাহিত্য। সাহিত্যের আকল্পে নিম্নবর্গের অপর থেকে প্রতিপক্ষে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, প্রাক্-মহাশ্বেতা পর্বের আখ্যানবিশ্বে আমরা যে নিম্নবর্গকে দেখলাম তা আসলে নাগরিক মধ্যবিত্ত বা কোনো ক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় চিন্তা চেতনায় গড়ে তোলা নিম্নবর্গ। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেন, দেবেশ রায়, ভগীরথ মিশ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা নাগরিক মানসিকতায় গ্রামীণ জীবন ও নিম্নবর্গকে দেখার বদলে তারা আরো প্রান্তে, গভীর অন্ধকারে, পাহাড়ে, জঙ্গলে প্রবেশ করে সেখানকার মানুষদের কথা টেনে বের করে এনেছেন। তারা বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসের মঞ্চে নিম্নবর্গকে 'অপর' থেকে প্রতিপক্ষে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সেদিক থেকে তাদের আমরা স্বতন্ত্র ধারার লেখক হিসেবে গণ্য করতে পারি।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ও সমাজে উপেক্ষিত জনজাতিকে তাঁর সাহিত্যের আধার করে তুলেছেন। তার বিখ্যাত 'বনবিবি উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'বাগদা' (১৯৮৩), ও 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' (১৯৮১) উপন্যাসে সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদিনের জীবনসংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর 'দধীচির হাড়' 'শাসখোল' 'কালবেলা', 'অন্নজল' প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে বাদা অঞ্চলের মানুষদের দুঃখ দুর্দশার চিত্র। 'ধানের গন্ধ' গল্পে দেখা যায় শ্রমজীবী ক্ষেতমজুরদের জীবনের যান্ত্রিকতা।

মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষদের কথা উঠে এসেছে আব্দুল জব্বার-এর কথাসাহিত্যে। তাঁর অধিকাংশ আখ্যানে এইসব সাধারণ মানুষদের কথা আমরা পেয়েছি। তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস 'ইলিশমারির চর' (১৯৬২) ধীবরজীবনের ধারাভাষ্য। জেলেজীবন নিয়ে যেসব বিখ্যাত উপন্যাস রচিত হয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসটি তার অন্যতম। জেলেদের জীবন-জীবিকা ও তাদের সংগ্রাম উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই ইলিশমারির চরে দুজন মহাজন-তারিনী ও তরবদি মাঝি। জয়নদ্দি উপন্যাসের মূল চরিত্র। সজীব ডাকাবুকো সহজ প্রকৃতির মানুষ জয়নদ্দি মহাজনদের শোষনে সন্তুষ্ট নয়, তাই সে মহাজনদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য জেলেদের সমবেত করতে চায়। জেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে স্বপ্ন দেখে নিজের জালে মাছ ধরবার- যাতে মহাজনদের থেকে ঋণ নিতে না হয় কোনোদিন। তাই সে তরবদি মাঝিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এবং জেলেদের দাবিকে মানতে বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রে জয়নদ্দি উচ্চবর্গের কাছে হেরে যায়নি। প্রতিবাদী ও অধিকার চেতনায় জেলেদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে সে। এছাড়া 'শঙ্খবালা' (১৯৭৫) উপন্যাস দেখা যায় প্রান্তিক নিম্নবর্গের চিত্র। যেখানে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলে ডুবুরিদের কথা উঠে এসেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রশিদ একজন ডুবুরি। মহাজন শোষণের শিকার রশিদের পিতা দীর্ঘ ৪০ বছর ডুবুরীর কাজ করে চোখের

দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। এরা মহাজনের হয়ে দিনের-পর-দিন সমুদ্র থেকে শাঁখা তোলার কাজ করে কিন্তু বিনিময়ে মহাজনেরা ডুবুরিদের যা পারিশ্রমিক দেয় তাতে তাদের অভাব মেটেনা। মহাজনদের এই বঞ্চনাকে সহ্য করতে না পেরে রশিদ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে অন্যান্য ডুবুরি ও মাঝিদের একত্রিত করে তাদের দাবি-দাওয়া মহাজনদের কাছে পেশ করে। মহাজনরা নানা অছিলায় তাদের নিরস্ত করতে চাইলেও ডুবুরিদের একতা ও প্রতিবাদের কাছে হার মানতে হয় তাদের। জয় হয় প্রতিবাদী চেতনার।

তাছাড়া তাঁর গল্পগুলির মধ্যেও দেখা যায়- দুঃখ-দুর্দশায়, রোগে-শোকে জর্জরিত মানুষগুলিকে। গ্রামগঞ্জের নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষেরা গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু। যেমন- 'বেদেনীর ফাঁদ' গল্পে হকার, 'তারাপদ ধাড়া', 'জীবন্ত জগদম্বা', 'বেতাল ভৈরব' প্রভৃতি গল্পে উঠে এসেছে সাধারণ কৃষক ও কৃষক পরিবারের কথা। 'বুভুক্ষা' গল্পে খয়রণ নাম্নী একজন ভিখারিনীর মধ্য দিয়ে সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। 'সাগরদ্বীপের মহাজন' গল্পে রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলে কাঠুরিয়াদের জীবনে একদিকে বাঘের হিংস্রতা অন্যদিকে মহাজনদের শোষণের চিত্র। 'শিকার', 'বদলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্পে দেখা যায় শ্রমিক জীবনের কাজের অনিশ্চিয়তা উচ্চবর্গের শোষণের চিত্র। 'সমুদ্র ভৈরবী' গল্পের লেখক ডুবুরিদের জীবন সংগ্রাম ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। আলোচ্য গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর 'সোঁদা মাটি নোনা জল' (১৯৯২) গল্প সংকলনের নানা গল্পে চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের অন্ত্যজ নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রামের কাহিনিকে চিত্রিত করেছেন। 'মানুষজন' গল্প-সংকলনের গল্পগুলিতেও নিম্নবর্গের ভিড়। গ্রামগঞ্জের নানা পেশার মানুষ যেমন- শ্রমিক, চাষী, মৌলবী, পতিতাদের আঁতের কথা লেখক নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

বাংলা গল্প-উপন্যাসকে যাঁরা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দেবেশ রায়। স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যের পালাবদলে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাস-গল্পগুলিতে কাহিনির চেয়ে ব্যক্তি-মানুষের অবস্থান গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে, যার অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিরাজ করছে সমাজের নিম্নবর্গ। তাঁর যেসব উপন্যাসগুলিতে নিম্নবর্গের পাঁচালী রয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মফস্বলী বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮), 'ইতিহাসের লোকজন' (১৯৯৭), 'বরিশালের যোগেন মন্ডল'(২০১০) প্রভৃতি। 'মফস্বলী বৃত্তান্ত'-এ দেখা যায়, লেখক উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দরিদ্র বুভুক্ষু মানুষের জীবন ও ক্ষুধার যন্ত্রণাকে এক নির্মম সত্যরূপে উদঘাটিত করেছেন। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটি লেখকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম। এখানে উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলির একটি তিস্তার তীরবর্তী অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের পাঁচশো বছরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

আর যেখানে রাজবংশী ও অধিবাসীরা রয়েছে সেখানে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় শোষকশ্রেণি ও অবস্থান করছে। জমিদার-জোতদাররা এসব আদিবাসীদের মানুষ বলে গণ্য করে না। কেন্দ্রীয় চরিত্র বাঘারু তার আসল নাম নয়, বাঘ মারার জন্য তার এটি পাওয়া নাম। তার কোনো নাম উপন্যাসে নেই। এই বাঘারুর জীবন ইতিহাসেরই বিবরণ আলোচ্য উপন্যাসটি। তার কোনো সামাজিক পরিচয় নেই- আত্মমর্যাদা ও মনুষ্যত্বহীন বাঘারুর একমাত্র পরিচয় সে গয়ানাথ জোতদারের মুনিস। বাঘারুর মতো লোকেরা কীভাবে চিরকাল বড়োলোকের দাসত্ব করে যায় তার বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে। কিন্তু একটা সময়ে গয়ানাথ একনিষ্ঠ বাঘারুকে তাড়িয়ে দিলে সে নিপুছাপুরের শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে যায়। বাঘারুদের মতো মানুষের মুখে তবু কোনো প্রতিবাদ নেই- প্রতিবাদ থাকতে নেই যেন। এরা তাই বরাবর উচ্চবিত্তদের প্রয়োজনে তাদের দিয়ে অমানবিক আজ পর্যন্ত করিয়ে নেয়, এবং প্রয়োজন করে ফেলে দিতেও দ্বিধা করে না। এই কষ্ট সহিষ্ণু মানুষগুলোর কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই- দেয় না কেউ। বাঘারুরা বরাবর উচ্চবিত্তের কাছে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেই কারণেই প্রতীকী অর্থে বাঘারুর কোনো নাম নেই উপন্যাসে। কারণ সেইসব বঞ্চিত-প্রতিবাদহীন-শোষিত মানুষগুলির প্রতিভূরূপে লেখক তাকে সৃজন করেছেন এবং তার জীবন ইতিহাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে আসলে লেখক নিম্নবর্গের ইতিহাসকেই লিখতে চেয়েছেন। উপন্যাসের মতোই দেবেশ রায়ের ছোটোগল্পগুলিও নিম্নবর্গের চালচিত্রে ঘেরা। 'মৃত জংশন ও বিপদজনক ঘাট'- গল্পে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রাম বর্ণিত। 'তিন পুরুষের উপাখ্যান', 'বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব' -গল্পগুলিতে রয়েছে তৎকালীন বাঙালি বুর্জোয়া সমাজের শোষন উৎপীড়নের ছবি। 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার' গল্পে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় আছে। 'মানুষ রতন' গল্পে দেখানো হয়েছে সত্তরের দশকে বারাসাত ও বরানগরে তৎকালীন প্রশাসক দ্বারা যে বিশালসংখ্যক সাধারণ মানুষদের খুন করা হয়েছিল—তার বিস্তৃত কাহিনি। আসলে দেবেশ রায় তাঁর আখ্যানে নিম্নবর্গকে আলোকিতই শুধু করেননি, সাহিত্যের মঞ্চে নিম্নবর্গকে প্রতিপক্ষ হিসেবে নির্মাণ করেছেন। (নাথ ২০০৭, পৃ. ৮৬-৯০)

দুই বাংলার প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সমাজ ও ইতিহাস সচেতন আখ্যান সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আখ্যান মূলত শ্রমজীবী মানুষের কথা বলে। তার বিখ্যাত দুটি উপন্যাস- 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৬) ও 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) -য় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'চিলেকোঠার সেপাই'- উপন্যাসে ১৯৬৯ এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের গণঅভ্যুত্থানের চিত্র বর্ণিত। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামবাংলার নিম্নবৃত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম। আর এই ঐতিহাসিক আবহে জমিদার,

জোতদার,বর্গাদার, আধিয়ারের সঙ্গে কামলা, কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে শোষণ নিপীড়ন ও বঞ্চনার টানাপোড়েন তার চিত্র উঠে এসেছে। তাছাড়া উঁচু-নিচু শ্রেণির বাদ-প্রতিবাদ, আর্থিক অভাবে মাঝি-কলুদের জাতিগত পেশা ছেড়ে কৃষিকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার করুণ চিত্র উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে লেখক যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাও নিতান্তই নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।

গ্রাম ও গ্রামের অপমানিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কথাকার হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিখ্যাত 'গহীন গাঙ' (১৯৭৯) উপন্যাসটি এর পরিচয়। উপন্যাসটি রচনার অভিজ্ঞতা ও কারণ সম্পর্কে লেখক 'গহীন গাঙ' এর ভূমিকায় জানিয়েছিলেন,

> "বিশেষ প্রয়োজনে সুন্দরবন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। প্রত্যক্ষ করেছিলাম অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবিকার সংগ্রাম। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার পাশাপাশি ধর্ম, লোকাচার, স্বপ্ন, অবিশ্বাসের দোলাচলে যে মানুষ বাঘ-কুমির-কামোট ও 'মনুষ্যদাপট' বুকে নিয়ে নোনা গাঙের 'গোন' 'বেগোন'- এর মতো, ইতিহাস তৈরি করছে- আধুনিকতা যাকে বলে সাবঅলটার্ন-এ উপন্যাস তাদের জীবনের কয়েকটা দিন।" (চট্টোপাধ্যায় ১৪১৮, পৃ. v-vi)

লেখকের ভূমিকাংশ থেকে স্পষ্ট যে উপন্যাসের মূল উপাদান নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন ইতিহাস। বাদা অঞ্চলে মাছমারাদের দাদন দেয় খাটিদারেরা। প্রকৃতপক্ষে এরাই নৌকা ও জালের মালিক। রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে এই খাটিদারেরা জেলেদের বাধ্য করে তাদের কাছে কম দামে মাছ বিক্রি করতে। বিভিন্ন আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণে জেলেরা তাদের যাতাকল থেকে বেরোতে পারে না। শুধু খাটিদারের অন্যায় শোষণ নয়, এদের সঙ্গে রয়েছে মহাজনরাও। ললিত ঈশ্বর মহাজনের কাছ থেকে তিন বছর আগে পঞ্চাশ টাকা ধার নিলে তার মৃত্যুর পর জানা যায় সেই টাকা সুদে আসলে দু'শো পয়তাল্লিশ টাকায় দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের এই ললিত চরিত্রটি আব্দুল-ঈশ্বরদের মতো খটিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু ললিতের অকস্মাৎ মৃত্যু প্রমাণ করে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক কৌশলের কথা। ললিতের নেওয়া ধার ও তার জমি আত্মসাৎ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে ঈশ্বর ও আব্দুল। ললিতের মৃত্যুর পর তার পুত্র শ্রীপদও এই মহাজন ও খটিদারের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। (চক্রবর্তী ১৪২০, পৃ. ১১৪-১২০) উপন্যাসের মতোই তাঁর গল্পগুলোতেও নিম্নবর্গের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। 'বন্ধুর বেশে' গল্পে গ্রামীণ জীবনের কুঁড়ে নামক সৎ যুবকের দুঃখ দুর্দশার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। 'চব্বিশ ফুট' গল্পটিতে মানুষের যাযাবর জীবন ও মেথরদের নিম্নবর্গীয় জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে।

আশির দশকে রচিত অভিজিৎ সেনের ‘রহু চন্ডালের হাড়’ (১৯৮৫) উপন্যাসটি বাজিকরদের দেড়’শ বছরের ইতিহাস। উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ সম্প্রদায়টি সমাজের অন্যান্যদের কাছে মানুষ বলে গণ্য নয়। তারা সমাজের কাছে অচ্ছ্যুৎ। শারিবার স্মৃতিতে শোনা যায়-

> ‘শারিবার নানির কথা মনে পড়ে। নানি বলত, আমরা তো অছুতের জাত রে, শারিবা। গোরখপুরে আমরা অছুৎ ছিলাম। তার আগেৎ যেথায় ছিলাম, সেথা তো হামাদের ছেঁয়া মারানো পাপ! সেথায় অছুৎ জাতকে রাস্তাৎ যাতে হলে ক্যানেস্তারা বাজায়ে যাতে হয়। লয়তো, জেতের মানষের গায়েৎ হাওয়া লাগে, ছেঁয়া লাগে। সি বড পাপ!’
>
> (সেন ১৩৬২, পৃ. ২২০)

নানি লুবিনির কথা অনুযায়ী যুগ যুগ ধরে পিতৃপুরুষের পাপের দায়বদ্ধ বহন করে চলেছে।কিন্তু এই ছুৎমার্গের মার্গ কারা প্রশস্ত করেছে। আসলে পিতৃ-পুরুষের পাপ যে আসলে নিম্নবর্গের নির্মাণকে ত্বরান্বিত করেছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।যারা সমাজের ধারক-বাহক তাদের সুবিধার্থে কোনো সম্প্রদায়কে এই অচ্ছ্যুৎ বা পাপের জালে জড়িয়ে চিরকাল নিম্নবর্গ করে রাখতে চায়।উপন্যাসের লেখক এই বাজিকর জনগোষ্ঠীর পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করা থেকে শুরু করে তাদের সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও যাযাবরের মতো এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাযাবর জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। বাজিকরদের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে উপন্যাস উঠে এসেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। কিন্তু সামাজিক দূরত্ব একারণেই বাজিকররা সাঁওতালদের বিদ্রোহে যোগদান করেনি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহু দিনের পর দিন আরো কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সে বুঝতে পারে, উচ্চবর্গের ভ্রষ্টাচারগুলি ধীরে ধীরে তার নিজ গোষ্ঠীর লোকেরাই রপ্ত করে নিচ্ছে। রহু একটা সময় স্বপ্ন দেখে বাজিকরদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে কিন্তু সে রক্ষা করতে পারে না শেষ পর্যন্ত। বাজিকরদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাধীকার প্রদান করা স্বপ্ন নিয়ে উচ্চবর্গের হাতে রহুকে প্রাণ দিতে হয়।কিন্তু রহু পরবর্তীকালে বাজিকরদের কাছে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। রহুর হাড়কে তারা নিজেদের মুক্তির স্মারক হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁর ছোটোগল্পগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গের গ্রামজীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। ‘পদ্ধতি’ গল্পে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের নকশালপন্থী হয়ে ওঠার আদর্শগত পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। ‘আইন শৃঙ্খলা’ গল্পে আছে মহাজনদের অত্যাচারের কথা, ‘ব্রাহ্মণ্য’ গল্পে রয়েছে জাতি সংস্কারের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনের আচার শক্তি ও সংস্কারের কথা। (ভট্টাচার্য ২০১০, পৃ. ৩০৫-১৫)

সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় নিম্নবর্গকে প্রধানরূপে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত ‘নদী-মাটি-অরণ্য’ (১৯৯৭) ‘মহুলবনীর সেরেঞ’ (১৯৯৫), ‘টাঁড় বাংলার উপাখ্যান’,

(২০০০) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির পটভূমি গ্রামবাংলা ও তার জনজীবন। তাঁর 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসটি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জনজীবন ও তাদের গান নিয়ে রচিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী মহুলবনী ও লামাডিহির সাঁওতাল জনজীবনে এই উপন্যাসের উপজীব্য। সাঁওতালি শব্দ 'সেরেঞ'-এর অর্থ গান। ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যে সাঁওতালি সংস্কৃতি অন্যতম। ১৯৮৫-৮৬ সালের ঝাড়খন্ড আন্দোলনে যখন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর সাঁওতাল জনজীবন উত্তাল হতে শুরু করেছে তখন উপন্যাসের ঘটনাকাল শুরু হয়েছে। উপন্যাসে জানা যায় মহুলবনি গ্রামে সত্তর ঘর সাঁওতাল বসবাস করে যাদের বেশির ভাগ কৃষি কর্ম করে দিন পরে। আমরা জানি, সাঁওতালদের মধ্যে সারা বছরই কোনো না কোনো উৎসব লেগে থাকে। সেই সারা বছরের উৎসবকে কেন্দ্র করেই লেখক তাদের লোকসংস্কৃতিকে উপন্যাসের উপজীব্য করে তুলেছেন। এখনও পর্যন্ত যেসব গল্প-উপন্যাসকে আমরা দেখলাম সেখানে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক দিককে কেন্দ্র করে উপন্যাস সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি, সেদিক থেকে 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসটি নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। (চক্রবর্তী ১৪২০, পৃ. ১৯০-৯৫) তাছাড়া তার 'নদী-মাটি-অরণ্য' উপন্যাসটি জল-জঙ্গল ভরা সুন্দরবন অঞ্চলের একশ বছরের ইতিহাস। তিন খণ্ডে বিভক্ত এই উপন্যাসে সুন্দরবনের মানুষেরা বন কেটে সেই অঞ্চলকে বসবাসের যোগ্য করে তোলে। কিন্তু জমিদার জোতদাররা তা দখল করে নিতে চায় এবং তাদের সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হয়। ঈশান সামন্তের পুত্র রামচন্দ্র সামন্ত সুন্দরবনে এসে আবিষ্কার করে এই অঞ্চলের আলো-অন্ধকারের দিকগুলি। দেখা যায় একশ বছরের বেশি সময় ধরে ইংরেজরা খাজনাকে অস্ত্র করে এই অঞ্চলের মানুষদের দ্বারা জঙ্গল কাটার জন্য বাধ্য করে চলছে। দিনের পর দিন এই অন্যায় সহ্য করে এই অঞ্চলের মানুষরা একটা সময় ইংরেজদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে এবং সুন্দরবনকে ইংরেজদের কবল থেকে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে বিদ্রোহ করে। সমগ্র উপন্যাসে নিম্নবর্গের তৈরি জমি, আশ্রয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—সবটাই ইংরেজদের লালসার শিকার হয়। বাইরে থেকে আসা রামচন্দ্র সুন্দরবনকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে ১৯৫০ সালে বর্গাদার আইনের ভিত্তিতে জমির উৎপন্ন ফসলের ভাগে চাষীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শোষকদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় সুন্দরবন অঞ্চলে। লক্ষণীয়, যারা পরিশ্রম করে জঙ্গলকে বসবাসযোগ্য করে তুলল, তাদের সেই বাসস্থান ও জমিকে দখল করতে বাইরের ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণির লালসা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষগুলোকে বঞ্চিত করেছে। একশ বছরের বেশি সময় ধরে তারা অধীন হয়ে ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। এভাবেই বারবার নিম্নবর্গের নির্মাণ করা হয়েছে একদল

স্বার্থলোভী মানুষদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। (সাঁফুই ২০১৮, পৃ. ৮৪-৯০) উপন্যাসের মতোই তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নিম্নবর্গীয় চিন্তা-চেতনা ও প্রতিবাদ উঠে এসেছে। 'রাজ্যপালের অসুখ' গল্পে- গ্রাম ও শহরের মানুষের সামাজিক বৈষম্যজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। 'কর্জ' গল্পে মহাজনী শোষণের চিত্র এবং 'বিষয় যখন গনা' গল্পে ভূমিহীন কৃষক এবং আদিবাসী গনার জমি কীভাবে দলতন্ত্র ও ভোটের রাজনীতির কবলে রাস্তার গর্ভে চলে যায় - সেই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

সত্তর দশকের বলিষ্ঠ লেখক ভগীরথ মিশ্র নিম্নবর্গের রূপকার হিসেবে পরিচিত। তাঁর কথাসাহিত্যে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়- সেখানে প্রধানত নিম্নবর্গের মানুষ, শ্রমিক, গ্রামীন প্রান্তিকজনের আনাগোনা। তাঁর বিখ্যাত 'চারণভূমি' (১৯৯৪), 'মৃগয়া' (১৯৯৬-২০০০), 'তস্কর' (১৯৯২) 'জানগুরু' (১৯৯৪), ইত্যাদি উপন্যাস নিম্নবর্গের কাব্যরূপে নির্মিত। 'তস্কর' উপন্যাসটি ইতিহাসের আঙ্গিকে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনায় উত্তরণের কাহিনি। এখানে বানেশ্বর ঘোষ একজন মহাজন, যার অধীনে কাজ করে এলাকার নামকরা সিঁধেল চোর গক্ষুর ভক্তা। বানেশ্বরের নির্দেশে গোক্ষুর বাড়ি বাড়ি চুরি করে। একটা সময় গোক্ষুর এই নিকৃষ্ট কাজ ছাড়তে চাইলে মহাজনের চাপে তা পারে না। বানেশ্বর মাঝেমধ্যে গোক্ষুরকে মিথ্যা চুরির মামলায় ফাঁসিয়ে আবার নিজেই জামিন দিয়ে খালাস করে। গোক্ষুরের পেছনে পুলিশি বা আইনি খরচগুলি গোক্ষুরের ধার হিসেবে ধরে মহাজন। শুধু তাই নয়, আদিবাসী প্রকল্পে যেসব জমি গোক্ষুর চাষের জন্য পায় সেগুলি ছলচাতুরি করে মহাজন নিজের নামে লিখিয়ে নেয়। উপন্যাসে একদিকে বানেশ্বর মহাজন ও তার হস্তগত পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যদিকে লধ্বাপাড়ার হতদরিদ্র নিম্নবর্গ। একদিকে শাসক, অন্যদিকে শোষিত অধীনস্ত লোধা জনগোষ্ঠী। তাইতো রাতে চোরের উপদ্রব ঠেকাতে বানেশ্বর পুলিশের উপস্থিতিতে ঠিক করে লোধারা রাতে পাহারা দেবে। কিন্তু লোধারা বুঝতে পারে- বাবুরা রাতে ঘুমাবে, আর তারা সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত জেগে পাহারা দেবে বিনা পারিশ্রমিকে। কিন্তু তারা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। প্রতিনিয়ত অপমান, বঞ্চনা ও পীড়নের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একসময় তাদের মধ্যে যে শ্রেণিচেতনা তৈরি হয়েছে তাই উপন্যাসের মূলকথা। 'চারণভূমি' উপন্যাসে দেখা যায় ভেরিহার ভকতদের যাযাবর জীবনযাত্রা। বিহারের হাজারিবাগের ভেরিহার ভকতরা মালিকের ভেড়া নিয়ে সারাবছর জলে-মাঠে-জঙ্গলে চরে বেড়ায়। এদের কোনো আশ্রয় নেই। ভেরিহার ভকতদের এই ভ্রাম্যমাণ জীবন চালানোর জন্য বাঘার মালিকের কাছ থেকে ঋণ নেয় তারা, এবং তা বাড়তে থাকে চড়া হারে। এই দাদন থেকে সারাজীবন তারা মুক্তি পায় না , ফলে বাঘার দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হয় তারা। বোঝাই যায়, নিম্নবর্গের নির্মাণ করা হয় অর্থ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে। অধীনতা

সূত্রে রচিত হয় এইসব ভেরিহার ভকতদের জীবনকথা। এছাড়াও গ্রামজীবনের বিচিত্র জটিল চিত্রের সমাহারে রচিত হয়েছে তাঁর 'জানগুরু' ও 'মৃগয়া' উপন্যাস দুটি। 'জানগুরু' উপন্যাসের বিষয় গ্রাম্য মানুষের অন্ধবিশ্বাস, ডাইন প্রথা, ভুত-প্রেতে বিশ্বাস। এই অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এবং সেই বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য ওঝাদের চোখ ধাঁধানো কর্মকাণ্ড চিত্রিত হয়েছে। সরল গ্রাম্য মানুষগুলিকে বোকা বানিয়ে নানা কিংবদন্তির সৃষ্টি করে তারা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওঝার পরিচয়ের আড়ালে সরকারি ক্ষমতা অর্জন করে ছতর বাউরি (ওঝা) গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সেই গ্রামীণ অঞ্চলে প্রভুত্ব ও অধীনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু তালডাংরার পরের প্রজন্ম বুঝতে পারে ওঝাদের ভড়ংবাজির কথা। ফলে তারা প্রচলিত লোকবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং ওঝাদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ভগীরথ মিশ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা 'মৃগয়া' উপন্যাসে ইতিহাসের আড়ালে প্রায় একশ বছরের সময়কালের প্রেক্ষাপটে সামন্ততন্ত্রকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে। এককথায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা (যেমন, স্বদেশী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, শ্রমিকদের আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা ও রাষ্ট্রপতি শাসন প্রভৃতি) বিশ্লেষণের পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিবাদ, চেতনা ও সর্বোপরি তাদের আবিষ্কার উপন্যাসের মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। (ভট্টাচার্য ২০১০, ৩৩০-৩৪০)

ভগীরথ মিশ্রের গল্পগুলির মধ্যেও দেখা যায় গ্রাম্য জীবনের নিম্নবর্গীয় সমাজকে। তাঁর 'জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প' (১৯৮৩) ও 'লেবারন বাদ্যিগর' (১৯৮৬) গল্পসংকলন দুটি প্রান্তিক ও নিম্নবর্গীয় জীবন নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। অন্তেবাসী নিম্নবর্গীয় জীবনে সংগ্রাম, বঞ্চনা, শোষণ, পিড়ন ইত্যাদি চিত্র ফুটে উঠেছে – 'ঝোরবন্দি', 'ইন্দোরযোগ', 'হুসমারার ভমরা মাঝি', 'কদমডালির সাধু', ' চিনিবাসের ঘরে ফেরা', 'পাঁঠার চোখ', 'খোলস' ইত্যাদি গল্পে। তাছাড়াও 'সুবচনী' গল্পে সুবচনী বাউরীর ষাট বছরের সংগ্রামময় জীবন ও 'ফসল কাটার গান' এ বাঁকুড়া জেলার নিম্নবর্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পাশাপাশি শোষণের চিত্রটিও বর্ণিত হয়েছে।

সত্তর দশকেরই আরো একজন নিম্নবর্গের কথাকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি মূলত তাঁর কথাসাহিত্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন ও বাদা অঞ্চলকে স্থান দিয়েছেন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'সহিস' উপন্যাসটি এর প্রধান প্রমাণ। ২০০৭ সালে বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসটিতে দক্ষিণবঙ্গের বারুইপুর সংলগ্ন ছোটো ছোটো গ্রাম, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের মানুষজন ও প্রকৃতি উঠে এসেছে।

‘সহিস’ শব্দের অর্থ ঘোড়া চালক। এই পেশাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাদা অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রাম উপন্যাসের মূল উপজীব্য। আবেদা ও হাসেম নামক এক মুসলমান দম্পতির পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়েছে। আমরা দেখেছি বারুইপুর সংলগ্ন গ্রামে প্রতিবছর একটি মেলা হয় যার নাম ‘ঘোড়াছুট’ মেলা। এই মেলায় প্রত্যেক ঘোড়ার মালিক একজন সহিস নিয়োগ করে যাতে তাদের ঘোড়াকে সে নিয়ন্ত্রণ করে ঘোড়াছুট প্রতিযোগিতায় জয়ী করাতে পারে। এখানে একজন সহিসের সার্থকতা। বাদামতোলীর মানুষগুলির জীবন একরৈখিকভাবে শোষণ-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে কেটে যায়। হতাশা, যন্ত্রণা ও ক্ষোভের মধ্যেও কোনো নিম্নবর্গীয় চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদ দেখা যায়নি। ঝড়েশ্বরের গল্পের প্লট গ্রাম বাংলার জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে। ‘নোনা’ গল্পে দেখা বিজয়ের জীবনের বিপন্নতা ও সংগ্রাম। সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকে কেন্দ্র করে গল্পে সামাজিক দোলাচলতার কথা উঠে এসেছে। ‘সিন্দুক’ গল্পে রয়েছে গ্রামের জোতদার ছনুবাবুর শোষণের বিরুদ্ধে ভাগচাষী ও বর্গাদারদের জাগরণ এবং সেই প্রতিবাদের কাছে ছনুবাবুর পরাজয়ের চিত্র। ‘জাহাজ-ঘাটা’ গল্পে দেখি কীভাবে নদী ভাঙনের বিপন্নতা, নিরাশ্রয় গরিব মানুষদের প্রতিবাদী করে তুলেছে।

আশির দশকের আরেকজন অন্যতম কথাকার হলেন অমর মিত্র। কর্মসূত্রে বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত ও অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্য জগৎকে পুষ্ট করেছে। পশ্চিম বাঁকুড়ার ঘটে যাওয়া খরার চিত্র স্বচক্ষে চাক্ষুস করে তিনি ‘হাঁস পাহাড়ি’ (১৯৯১) ও ‘ধ্রুবপুত্র’ (২০০২) উপন্যাস দুটি রচনা করেছেন। শালতোড়া, বেলিয়াতোড়ের জলহীনতাকে ধ্রুবপুত্রের প্লট হিসেবে নির্বাচন করেছেন লেখক। ‘ধনপতির চর’ উপন্যাসে দেখা যায় বহুজাতিকের আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে চরবাসীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। ‘পাহাড়ের মতো মানুষ’ উপন্যাসে রয়েছে গ্রামীণ সমাজের পুরাতন জমিদারি ব্যবস্থার ছবি। যেখানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে একটি গ্রামের সমস্ত মানুষের শোষণের চিত্র। অমর মিত্রের আখ্যানগুলি নিম্নবর্গের জীবন, মুসলমান সমাজ ও মানসিকতায় শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিকরা নিম্নবর্গকে সাহিত্যের মূল আধার করে আখ্যানরচনা করলেও অন্ত্যজ শবর-লোধা জাতিদের নিয়ে মহাকাব্যোপম উপন্যাস রচনা এর আগে হয়নি। সত্তর-আশি দশকের লেখক নলিনী বেরা শবর সম্প্রদায়কে নিয়ে ‘শবরচরিত’ (২০০১-২০০৫) উপন্যাসটি চার খণ্ডে রচনা করেছেন যা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এক নবতম সংযোজন। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু অঞ্চল জুড়ে রয়েছে তপোবন জঙ্গলমহল। সেখানকার লোধা-শবররা বিশ্বাস করে জঙ্গল হল মা এবং লোধা-শবর তার সন্তান। চারপর্বে বিন্যস্ত উপন্যাসের

কাহিনিতে দেখা যায়, লোধা-শবরদের মোড়ল রাইবু ও তার সহকারী গুড়গুড়িয়াকে। শবরদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড যেমন-শালবল্লা চুরি করা, মাছ ধরা, জঙ্গল ঘুরে খাবার সন্ধান করা ও তাদের নানা সংস্কৃতির পরিচয়ের সঙ্গে বনজঙ্গলকে কেন্দ্র করে সরকারের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ চিত্রিত হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকার একসময় আইন করে শবর জনগোষ্ঠীকে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করলে শবরদের সঙ্গে সরকারের এক প্রকার দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। লোধাদের নেতা রাইবু এ প্রসঙ্গে কিছুটা গুরুত্ব পেলও আখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র আসলে সমগ্র লোধা-শবরগোষ্ঠী। লোধাদের জন্য লড়াইয়ের প্রচেষ্ঠা করেও রাইবু শেষে ব্যর্থই হয়েছে, তারা উপলব্ধি করেছে যে জঙ্গল থেকে তাদের ধীরে ধীরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। উপন্যাসের শেষে তাই দেখা যায়, বাধ্য হয়ে জীবন ও জীবিকার তাগিদে জঙ্গল ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতে লোধাদের জন্য একটি বৃহৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বয়ে আনে। এছাড়াও সম্প্রতিককালে তাঁর আরো একটি উপন্যাস ‘সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা’ (২০১৬)। আত্মজৈবনিক উপাদানের পুষ্ট উপন্যাসটির আখ্যান রচিত হয়েছে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলোকে নিয়ে। লেখকের শৈশবের স্মৃতি নির্ভর উপন্যাস প্রথম পরিচ্ছেদটি পর্যায় ক্রমে দেখা যায়- সুদূর বিস্তারী সুবর্ণরেখা ও ডুলুং নদীর মাঝে জঙ্গলমহল ও কৃষিভূমি ইত্যাদি মিলিয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্র সেখানে বর্গী ও মোগল আক্রমণ করেছে। নীল চাষ পর্বে ইংরেজরা এখানকার মানুষদের উপর অত্যাচার করেছে। নতুন চর জাগলে- তার দখল নিয়েও খুনোখুনি-মারামারি ঘটে যায় এখানে। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি পরবর্তীকালে কীভাবে প্রবাদ ও গানে পরিণত হয়েছে তার বিভিন্ন টুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়ে আদিবাসী জীবনের চিত্র কাহিনির আকারে লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। উপন্যাসের মতোই গল্পকার হিসেবে নলিনী বেরা স্বতন্ত্র। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় সমালোচক অমলেন্দু চক্রবর্তী বলেছেন,

> ‘নলিনী বেরার শিল্পীসত্তার সমগ্রতা জুড়েই গ্রাম বা পল্লি প্রকৃতির সংবৃত্তি। এই নিসর্গ কোনো স্তব্ধ স্থবিরতা নয়। কিংবা আকাশ মাঠ গাছপালা পশুপাখি নদীনালার দিগন্ত প্রসারে মানুষই তাঁর সৃজন ভাবনার অন্তবীজ। সে মানুষ অশিক্ষায় দারিদ্র্যে স্থবির, অস্বাস্থ্যে ভঙ্গুর। ... নাবালকসদৃশ এই মানবগোষ্ঠীই যে তাঁর সর্বাধিক আপন ; বাংলার গ্রামই তাঁর মানসচৈতন্যের যথার্থ আশ্রয়ভূমি নলিনী সেটা জানেন।’ (বেরা, ২০০৩ পৃ. ix)

তাঁর ‘শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব’ গল্পে দেখান হয়েছে দুটি চাষের বলদ একজন চাষীর জীবন কত বড়ো সম্পদ হতে পারে যা একটি পরিবারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সহায়ক। তার সঙ্গে আর্থিক স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির তুলনা হতে পারে না। ‘শতরঞ্চি’ গল্পে গ্রামজীবনের স্বার্থ, সংকীর্ণ মানসিকতা ও কুসংস্কারকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। তাছাড়াও ‘বসুন্ধরা’, ‘এই এই লোকগুলো’, ‘পুষ্কর’ ইত্যাদি গল্পগুলি গ্রাম জীবনের পটভূমি করে গ্রাম্য জীবনকেই ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লেখকের।

সাম্প্রতিককালে যেসব লেখক নিম্নবর্গ-প্রধান কথা সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য সাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত। তিনি মূলত 'সাবঅলটার্নদের' নিয়ে লিখেছেন। মফস্বল শহর, গ্রাম এবং গ্রাম জীবন তাঁর লেখার উপজীব্য। আসলে দারিদ্র্যই জীবনের সঙ্গে যোগ করে জীবনের বহুমাত্রিকতা। লেখক এই বহুমাত্রিকতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। সৈকত রক্ষিতের জন্ম পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এক গ্রামে এবং তাঁর লেখাতেও পুরুলিয়া সাঁওতালি-সাঁওতাল আদিবাসীদের কথাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উঠে এসেছে। তাঁর নিম্নবর্গপ্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হাড়িক' (১৯৯০), 'ধুলা উড়ানি' (১৯৯৬) , 'মহামাস' (২০০৫), 'মদনভেরি' (২০০৮) প্রভৃতি। পুরুলিয়া জেলার খরিদুয়ারা ও কুমারী নদী তীরবর্তী এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অসহায়তা, ব্যর্থতা, দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম, আনন্দ-বিষাদ, ও স্বপ্ন সম্ভাবনা আঞ্চলিক ভাষায় আবহে এক জীবন্ত ক্যানভাস 'ধুলাউড়ানি' উপন্যাসটি। কাহিনির মধ্যে তেমন অভিনবত্ব না থাকলেও দৈনন্দিন জীবন যাপনের মানুষ কতোটা নিচ সংকীর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা উক্ত অঞ্চলের প্রান্তিক নিম্নবর্গ সমাজকে দেখলে বোঝা যায়। 'মহামাস' উপন্যাসে দেখা যায়, লম্পপট্টি কারখানার কর্মীদের পুরুষানুক্রমিক জীবিকা বয়ে চলছে। অন্যদিকে 'হাড়িক' উপন্যাসে লেখক প্রাচীন অন্ত্যজ হাড়ি সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মদনভেরি' উপন্যাসে খাসি জনজাতিকে লেখক তুলে ধরেছেন। আসলে উপন্যাসটির মূল বক্তব্য হল- মদনভেরি নামক এক বাদ্যযন্ত্রের মিথ ও লোক বিশ্বাসের সঙ্গে খাসি জনজাতির সামাজিক অবস্থানের নানা চালচিত্র উঠে আসা। খাসিরা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় একটি সম্প্রদায়। মদন ভেরি বাজানো তাদের পূর্বপুরুষদের বৃত্তি বা পেশা ছিল, কিন্তু কালচক্রে তারা এই পেশা থেকে সরে এসেছে। আলোচ্য উপন্যাসেও জীবিকার সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই বিস্ময়কর পেশা ও পেশা সংকট নিয়েই 'মদনভেরি' উপন্যাসটি রচিত। তবে কেবল উপন্যাস নয়, গল্পকার হিসেবেও সৈকত রক্ষিত রাঢ়বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের অন্ত্যজ নিম্নবর্গের জীবনচিত্র অংকনে তৎপর। লেখকের 'জন্মভূমি বধ্যভূমি' -গল্প সংকলনে দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যায়। জন্মভূমি বলতে এখানে লেখক তাঁর জন্মভূমি অর্থাৎ পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিবেশের কথা বুঝিয়েছেন। আর বধ্যভূমি বলতে বোঝানো হয়েছে- কীভাবে জন্মভূমি থেকে নিম্নবর্গের অসহায় মানুষদের স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। 'উৎখাতের পটভূমি' ও 'উচ্ছেদ' গল্পদুটিতে নিজভূমে পরবাসী হওয়ার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। তাছাড়া 'লক্ষণ মহিম'- গল্পে হাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিমের জীবিকা সংকট ও জীবিকা বদলে মোষের সিং এর চিরুনি বানানো তাদের মূল

পেশা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। 'খাদান'- গল্পে রয়েছে পাথর ভাঙ্গার কাজে নিযুক্ত মানুষদের কথা। 'ধমন' গল্পে দেখা যায়, ভ্রাম্যমান ধাতু শিল্পীদের জীবন-সমস্যার চিত্র। 'মাড়াই কল' গল্পে আখ মাড়াইয়ের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র রয়েছে। 'হাম্বা' গল্পে গোবিন্দ মুচির অভাব-অনটনের চিত্র রয়েছে। এরকম করেই সৈকত রক্ষিতের গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে পুরুলিয়ার অন্ত্যজ, প্রান্তিক মানুষেরা। তাদের জীবন-জীবিকা দুঃখ- দুর্দশা ভাষা -সংস্কৃতির আকর রূপে লেখকের কথাসাহিত্য পুষ্ট ও স্বতন্ত্র।

কথাকার রামকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর জন্ম স্থান বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের প্রকৃতি জনপদ ও মানুষজনদের সংস্কৃতিকে তাঁর কথাসাহিত্যের আধার করে তুলেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চারণে প্রান্তরে' (১৯১৩) দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার প্রকৃতি পরিবেশ ও গ্রাম্য মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের কাহিনি। 'দুখে কেওড়া উবাচ' (২০০২) উপন্যাসটি অন্ত্যজ জীবনের দুঃখ-দুর্দশার বয়ান। উপন্যাসের ব্লার্বে কাহিনির মর্মবস্তু হিসেবে দেখা যায়, দুখে একজন কৃষিমজুর। প্রৌঢ়ত্বের ভারে সে এখন দেশি মদের ব্যবসা করে। দুঃখের জীবনের প্রতিটি ধাপ লেখক কৌতুকের আড়ালে বিন্যাস করেছেন। গল্পকার রামকুমার তাঁর গল্পগুলিতেও ব্রাত্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। 'মৌজা ডোমপাটি' গল্পে প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। 'গোষ্ঠ' গল্পে দেখা যায় একজন রাখালিয়া বালকের কাহিনি। গ্রামীণ পরিবেশর ছবি রয়েছে 'খুকু কিংবা মানুষ' গল্পে বিশ্বায়নের যুগে নিম্নবর্গ কতটা অসহায় তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে এবং কৃষি ও গ্রামের বিনষ্ঠির সঙ্গে জীবিকার সংকট নিম্নবর্গকে কীভাবে কোণঠাসা করে ফেলে তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

আশির দশকের বিশিষ্ট কথাশিল্পী অনিল ঘড়াই ছিলেন অন্ত্যজ জীবনের রূপকার। তাঁর কথাসাহিত্যের মূল সম্পদ দলিত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনচর্যা। বিশেষ করে নদিয়া, মেদিনীপুর ও সিংভূম অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের ছবি পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। অনিল ঘড়াই-এর প্রথম উপন্যাস 'নুনবাড়ি' (১৯৮৯) নুনমারা সম্প্রদায়ের একজন অবহেলিত নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি। কালোচাঁদের স্ত্রী লবঙ্গ তার জীবনের সব হারিয়েও হেরে যায় না, বরং অদম্য জেদ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, আঁকড়ে ধরে মাটির নুনবাড়ি, যেখানে পাতন পদ্ধতিতে নুন তৈরি করা হয়। এভাবেই নুন ও নারী একাকার হয়ে যায় আলোচ্য উপন্যাসে। 'মুকুলের গন্ধ' (১৯৯৩) উপন্যাসটি রচিত হয়েছে জগেন জমাদারের পরিবারকে কেন্দ্র করে। জগেন ও আন্নাকালির শত দুঃখের সংসারে চিত্রের মাঝে তাদের একমাত্র সন্তান অর্জুনের দিন কাটে শূয়োর চড়িয়ে কিন্তু অর্জুনের সমবয়সি বাবলু সমাজের ঢাকি পরিবারের ছেলে হয়েও দেশকালের খবর রাখে। আসলে গ্রামসমাজ বৃত্তিনির্ভর কাজের নিরিখে বিভাজিত

হলেও কালক্রমে অর্থ উপার্জনকেই তারা মুখ্য বলে মনে করতে থাকে। ফলে সকলেই তারা পিতৃপুরুষের পেশা ছেড়ে বিভিন্ন পেশার দিকে ঝুঁকতে থাকে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখান হয়েছে, বাবলু একজন নিম্নবর্গের সন্তান হয়েও কীভাবে জাতিগত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাই বাবলুর মুখে শোনা যায়,

> '- কি হবে ঢোল বাজিয়ে? আজকাল কেউ ঢাক-ঢোল শোনে? এটা হলো গিয়ে মাইক-তাসা- ব্যান্ডের যুগ। ...ঢাক বাজিয়ে ঢাকির যদি পেট না ভরে -তাহলে সে ঢাক বাজাবে কেন?' (ঘড়াই ১৯৯৩, পৃ. ১১৮)

'মেঘ জীবনের তৃষ্ণা' (১৯৯৬) উপন্যাসের লেখকের হাড়ি সম্প্রদায়ের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি –জীবন ঐতিহ্য ও জীবিকার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান' (১৯৯৭)- এ আছে বিহারের আদিবাসী জনজাতির শীতকালে নদীতে সোনা খুঁজতে যাওয়ার কাহিনি যা তাদের জীবিকা। 'বনভূমি' (১৯৯৮) উপন্যাসে দেখা যায়- আদিবাসীদের দরিদ্রপীড়িত জীবনের সমান্তরালে বনভূমি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাক-শকুনের চিৎকার, মরা ইঁদুরের দুর্গন্ধময় পরিবেশে রোগে জর্জরিত মানুষগুলির চিকিৎসা করতে গুনিন আসে । গুনিন এলে বকরির পূজা হয়। এরকমই নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে তলিয়ে যায় এই অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষেরা। 'নীল দুঃখের ছবি' (২০০১) উপন্যাসটি কাকমারা সম্প্রদায় নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা উপন্যাস। সাধারণত এরা শুকর পালন করলেও এদের আসল জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। 'সামনে সাগর' (২০০৩) উপন্যাস এসেছে শ্রমহীন- ভূমিহীন-সম্বলহীন কিছু মানুষের কথা। দীঘার সমুদ্রকে অবলম্বন করে নানা পেশার মানুষের জীবন চক্রকে দেখান হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। অনিল ঘড়াইয়ের স্মরণীয় সৃষ্টি ও কীর্তি হলো 'অনন্ত দ্রাঘিমা' (২০০৯) উপন্যাসটি। উপন্যাসের আখ্যানে প্রান্তিক জনজীবনের চিত্র বিস্তৃত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। (সিংহ ২০১৭)

অনিল ঘড়াই-এর গল্পগুলিতেও দেখা যায়, গ্রামবাংলার দারিদ্র্য নিম্নবর্গীয় জীবনের চালচিত্র। তার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায় 'নুনা সামাডের গল্প' যেখানে নুনা সামাড একজন আদিবাসী কৃষক। গ্রামাঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। 'লাস খালাস' গল্পে নিধু ডোমের কাছে বেঁচে থাকা মানে পেট ভরে খওয়া, নেশা করা, লাশ পোড়ানো আর শরীরটাকে শ্মশান আর বাড়িতে আসা যাওয়ার মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া। 'খরা' গল্পে দেখা যায় হতদরিদ্র মানুষগুলি খাবার পাতে সামান্য পান্তা পেলেই খুশি হয়। লক্ষণীয় তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে কেউ চামার, কেউ মুচি, কেউ ছুতোর, কেউ কাকমারা, হাড়ি, জমাদার, ভিক্ষুক, কেউ ঢাকি ইত্যাদি সমাজের নিম্নবৃত্তি ও নিম্নশ্রেণির মানুষেরা স্থান নিয়েছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র অনিল ঘড়াই সম্বন্ধে বলেছেন –

> ‘অনিলের (ঘড়াই) মতো গ্রামজীবনকে নিয়ে এত নিবিষ্টভাবে, এত অনুপুঙ্খ সহকারে আমাদের মধ্যে কেউই বুঝি লেখেননি। গ্রামজীবনে এমন অতলান্ত অবগাহন, আর কারোর কলমেই আসেনি। (ভৌমিক ১৪১২, পৃ. ১১২)

আশি-নব্বই দশকের আরেকজন বিখ্যাত কথাশিল্পী আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮) তাঁর সৃজনবিশ্বে মুসলমান সংখ্যালঘুদের স্থান দিয়েছেন। ‘ঘরগেরস্তি’ (১৯৮২), ‘সানু আলির নিজের জমি’ (১৯৮৯), ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা’ (১৯৯৫), ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’ (১৯৯৬), ‘দ্বিতীয় বিবি’ (১৯৯৭), ‘মেটিয়াবুরুজে কিসসা’ (২০০৩) ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের ভাষ্য, তাদের জীবনযন্ত্রণাকে ‘কিসসা’-আকারে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও আফসার আমেদের যেসব গল্পে মুসলিম নিম্নবর্গীয় সংখ্যালঘুদের কথা উঠে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য – ‘খরা’, ‘গোনাহ্’, ‘হাড়’, ‘আদিম’, ‘বাগদান’, ইত্যাদি গল্প। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে খরা কীভাবে অভিশাপ বয়ে নিয়ে আসে তার মর্মান্তিক চিত্র রয়েছে ‘খরা’ গল্পে। জমি কৃষিদের উপার্জনের মূলভিত্তি। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরার সৃষ্টি কৃষি জনজীবকে দারিদ্র্যে পর্যবসিত করেছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে নানা আধিভৌতিক সংস্কার ও বিনাশের দিকটি তুলে ধরেছেন লেখক। (খান ২০২০)

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নগর ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ করা গেলেও নগর অতিক্রম করে তিনি সাঁওতাল পরগনা, বুরুন্ডির জঙ্গল, চাইবাসার ভৌগলিক অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। সেইসব অঞ্চলে নিম্নবর্গের জনজীবনকে তাঁর কথাসাহিত্যে অনুপ্রবেশ করতে দেখা যায়। তবে কলকাতা নগরের নিম্নবর্গের চরিত্রকেও তিনি তুলে ধরেছেন। যেমন ‘কলকাতা, তুমি কার?’ উপন্যাসে মেথর-ধাঙড় এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সাফাই কর্মীদের কথা উঠে এসেছে। পাঁচের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চলচিত্রের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রভাবের পাশাপাশি জনতার ভিড়ে মিশে থাকা সর্বহারা শ্রেণির মেথর-ধাঙড়দের কথা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আন্তরিক সহানুভূতির মধ্য দিয়ে তাদের অস্তিত্বের তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার ‘জঙ্গলের দিনরাত্রি’ (১৯৮৮) উপন্যাসে বিজয় ও লেমসা নামক দুই নিম্ন বর্গীয় পুরুষের জীবন-সংগ্রামকে দেখা যায়। বিজয় রেস্তোরাঁর একজন মদ পরিবেশনকারী এবং লেমসা হল হেমাডির বাংলোর একজন চৌকিদার। সন্দীপনের ‘ছেলেটা’ ছোটোগল্পে গণেশ চরিত্রটি পিতামাতাহীন ফুটপাতের ভিক্ষুক। কুড়ি-ত্রিশ পয়সা রোজগার করে মুড়ি বাতাসা খেয়ে কোনোরকমে পেট ভরায় সে। রাস্তার ধারে ন্যাকড়া পেতে ঘুমায়। রাস্তায় ফেলে দেওয়া দইয়ের হাড়ি বা ছেঁড়া জামা কুড়িয়ে নেয় সে। এভাবেই পথশিশুদের দিন অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে

থাকে। ‘বনধ এর ১০ দিন’ তুলসী দাস নামক এক মেথর চরিত্রের কাহিনি। ‘আলমারি’ গল্পে দেখা যায় এক গরীব রিক্সাচালককে। তার সঙ্গে ঠাকুর সিং ও তার কুলিমজুরদের দল। সন্দীপনের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি থাকলেও তা সরব নয়। (দাস ২০১৯, পৃ. ১৭০-৭৫)

পেশায় সাংবাদিক সাহিত্যিক ঘনশ্যাম চৌধুরী সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছেন। লাভ করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জেলেদের নিয়ে রচনা করেছেন ‘অবগাহন’ (২০০০) উপন্যাসটি। বাংলা সাহিত্যে যে কটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রয়েছে, তার মধ্যে ‘অবগাহন’ একটি। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিখিত আলোচ্য উপন্যাসে এক জেলেনারীর দুর্নিবার প্রেম-আকাঙ্ক্ষা ও যৌনচেতনার দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর গল্পের ভেতরেও লক্ষ করা যায় প্রান্তিক, শ্রমজীবী মানুষের কাহিনি। সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে কয়লাখনির শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ তাঁর গল্পগুলিতে খনি শ্রমিকের জীবনচিত্র সহজেই উঠে এসেছে। ‘আপনজন’ গল্পে খনি শ্রমিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে সুড়ঙ্গ খোদাই করে আকরিক তুলে নিয়ে আসে তার বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও ‘নিয়তি ছিল অন্ধকারে’, ‘মরদ’, ‘পুরনো পৃথিবীর মানুষ’ প্রভৃতি গল্পে কয়লা খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের কথা উঠে এসেছে। ‘মরদ’ গল্পে দেখা যায়, দিলীপ বাউরি তার সহশ্রমিকদের প্রাণ বাঁচাতে নিজে কয়লার ডাম্পারের নিচে পিষে গিয়েছে।

পেশার দিক দিয়ে কৃষক আনসারউদ্দিন তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে কৃষি জীবনের সঙ্গে জমি-মাটি-ফসলের অন্তর্গুঢ় সম্পর্কের পাশাপাশি বন্যা, ফসলের ক্ষতি, কৃষি অর্থনীতর দারিদ্র্য-অভাব-অনটনের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আনসারউদ্দিনের গল্প সংখ্যা স্বল্প হলেও(২২ টি) তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পে দেখা যায়- কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা কীভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে। তাঁর ‘আবাদ’ ও ‘পূবালি’ গল্পে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। ‘কবর’ গল্পে দেখা যায়- ভিকু নামক একজন চরিত্র যে কবর খোড়ায় পারদর্শী। কিন্তু একদিন তার মিথ্যে মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে তার অসহায় জীবনমৃত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ‘শত্রুপোকা বন্ধুপোকা’ গল্পে পোকামাকড় চাষবাসের কী ক্ষতি করে এবং তার প্রভাব কৃষিজীবনে কী মর্মান্তিক পরিণতি আনে তা দেখান হয়েছে। তাছাড়া তাঁর কৃষি জীবন ও চাষবাস সংক্রান্ত গল্পগুলির মধ্যে ‘হাল-বেহাল’,’ ‘ঘুম’, দহন’, ‘গোরস্থানের অধিকার’ প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে সোহরাব হোসেনের উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করা যায় কৃষক সমাজের উপস্থিতি। লেখক স্বয়ং একজন প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সন্তান। নিজের হাতে ধান রোপন ও ধান কাটার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাস গল্প ছবি তুলে ধরেছেন। সোহরাব হোসেনের ‘ মাঠ জাদু জানে’ (২০০৪) উপন্যাসে

দেখা যায় একটি কৃষক পরিবারের চার প্রজন্মের উত্থান পতনের কাহিনি। এই কৃষক পরিবারটির মধ্য দিয়ে উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে কৃষি আন্দোলনে ধারাবাহিক ছবিটি বিস্তৃত আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, জমিতে কৃষকরা দিনরাত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়,বন্ধ্যা জমিকে উর্বর করে তোলে, কিন্তু সেই জমিতে তাদের ফলানো ফসলের অধিকাংশ চলে যায় জমিদার ও ক্ষমতাবানদের হাতে। জমির ওপর তাদের কোনো অধিকার থাকে না। ফলে ক্ষমতা সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। ক্ষমতার অধিকারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারের লড়াইয়ে তারা সামিল হয়। এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক পরিবারটি জড়িয়ে পড়ে। ‘গাঙ-বাঘিনি’ (২০১১) উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের অরণ্য সংকুল প্রকৃতির মধ্যে মানুষের বাসভূমি গড়ে তোলা, সেই বনভূমির বাস্তুতন্ত্র কে টিকিয়ে রাখার পেছনে মাঝি-মাল্লাদের অবদান আলোচিত হয়েছে। মানুষ বাঘের বাসস্থানে অরণ্যচারী মানুষের বেঁচে থাকার কাহিনি হল - ‘গাঙ-বাঘিনি’। (দাস ২০১৯, পৃ. ১৯৩-২০০)

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে যারা নিম্নবর্গকে উপজীব্য করে তাদের অধিকারবোধ চেতনা ও প্রতিবাদের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নাম অগ্রগণ্য। আশির দশকে লেখা শুরু করলেও পেশায় রিস্কা চালক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি একুশ শতকের প্রথম দশকে। তাঁর আত্মজীবনীর নাম ‘ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন’ (২০১৪)। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘অনভুবন’ (২০১৭), ছেঁড়া ছেঁড়া জীবন (২০১৯), ‘বাতাসে বারুদের গন্ধ’ (২০১৯) ইত্যাদি। তাঁর গল্পগুলি দুটি খণ্ডে সংকলিত করা হয়েছে। প্রথম জীবনে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘকাল জেলজীবন অতিবাহিত করেন। জীবনের চরমতোম অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন এই জেলজীবনে। সেই অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ একে একে উপন্যাস ও ছোটোগল্প রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ‘বাতাসে বারুদের গন্ধ’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। নকশাল আন্দোলনকারীদের মিটিং, মিছিল, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো ও পুলিশের নির্বিচারে সাধারণ মানুষদের খুন, হত্যা, এনকাউন্টারের মর্মান্তিক চেহারা ফুটে উঠেছে।

এ ছাড়াও অধুনা বাংলাদেশের যে সমস্ত সাহিত্যিকদের রচনায় প্রান্তিক, অন্ত্যজ, অনগ্রসর, শ্রমজীবী তথা নিম্নবর্গের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলী, সেলিনা হোসেনের ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’ আবুবকর সিদ্দিকির ‘খরদাহ’ ও ‘জলরাক্ষস’, ইমদাদুল হক মিলনের ‘যাবজ্জীবন’, ‘কালাকাল’, সালমা বাণীর ‘ভাংগারি’, সালাম সালেহউদ্দিনের ‘জন্মদৌড়’ উপন্যাস এবং অবশ্যই এই তালিকার অন্যতম সংযোজন হরিশংকর

জলদাসের ‘জলপুত্র’, ‘দহনকাল’, ‘কসবি’, ‘রামগোলাম’-এর মতো উপন্যাস। এইসব লেখকেরা নিম্নবর্গের জীবনবৈচিত্র্য রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

## নিম্নবর্গের আকল্প নির্মাণের প্রবণতা ও প্রাপ্তি

বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পের সূচনালগ্নে নিম্নবর্গ উপস্থিত হয়েছে আখ্যানের প্রয়োজনকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে। কাহিনির উদ্দেশ্য পূরণে নিম্নবর্গ সহায়ক হয়েছে মাত্র। লক্ষণীয়, কল্লোল পূর্ববর্তী সময়কালের কথাসাহিত্যে দরিদ্র, ব্রাত্য, প্রান্তীয় সমাজের শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের চিত্র তেমনভাবে কেউ সহানুভূতির সঙ্গে তুলে আনেননি। নিম্নবর্গের ঘরের চার দেওয়ালে প্রবেশ করে তাদের আঁতের কথা তুলে ধরার জন্য তেমন কেউ এগিয়ে আসেননি। লক্ষ করা গেল, তাঁদের লেখায় শহরকেন্দ্রিক মজুর তথা শ্রমজীবী মানুষের দিনলিপি রচিত হচ্ছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত গ্রাম্য-প্রান্তীয় ব্রাত্যসমাজের হতদরিদ্র, নিষ্পেষিত মানুষগুলির কাছাকাছি তাঁরা পৌঁছাতে পারেননি। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভেতরে কীভাবে, কোনো নিয়মে ব্রাত্য-প্রান্তীয় মানুষগুলি শাসিত ও শোষিত হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র উঠে আসা তখনও বাকি ছিল। আসলে কল্লোলের তরুণ মনের লেখকেরা একপ্রকার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মতো নিম্নবর্গকে চিত্রায়িত করার ক্ষুধায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁদের লেখায় আমরা যে শ্রমজীবী-কুলি-মজুর-ভিখারিদের পাই, তাদের কথা সত্য ও মর্মান্তিক হলেও বাস্তবতার ছোঁয়া সেখানে পাওয়া যায়নি। কল্লোলগোষ্ঠীর এই বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে না পারার সীমাবদ্ধতা আমরা বুঝতে পারলাম ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের পর। ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯) ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ (১৯৫১) ‘কবি’ (১৯৪৪) ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬) প্রভৃতি উপন্যাস লিখে তাঁরা প্রমাণ করলেন নিম্নবর্গের প্রান্তিকতা, অসহায়ত্ব, বিশ্বাস-সংস্কার, আশা-স্বপ্ন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও সামাজিক স্বতন্ত্রতাকে। নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র উপস্থিতির বাস্তবচিত্রের পূর্ণতা আমরা পেলাম সতীনাথের ‘ঢোঁড়াইচরিতমানস’ (১৯৫০), অদ্বৈতর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬)-এ। এঁদের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে প্রান্তীয় নিম্নবর্গের কেন্দ্রীকরণের সূচনা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী কথাসাহিত্যে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের উপস্থাপনের দিকটিই উঠে এল না, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল উচ্চবর্গের বিপরীতে প্রতিনিয়ত কীভাবে নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়ে চলেছে। উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গ কীভাবে শাসিত ও শোষিত হয়ে সামাজিক অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে-এই বিষয়টি লক্ষ করা গেল। নিম্নবর্গের নিজস্ব ভাবাদর্শের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিপক্ষে তাদের শ্রেণিচেতনার দিকটি গুরুত্ব পেল আখ্যানগুলিতে। অদ্বৈত ও সতীনাথের কলমে যার সূচনা হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ রূপ

আমরা পেলাম অমিয়ভূষণ মজুমদার থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাশিল্পে এবং সাম্প্রতিককালের নলিনী বেরা, অমর মিত্র, অনিল ঘোড়াই, সৈকত রক্ষিত, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, হরিশংকর জলদাসের কলমের মধ্যে দিয়ে যা আজও অব্যাহত গতিতে সচল।

কল্লোলগোষ্ঠী যে উৎসাহ ও উন্মাদনা নিয়ে প্রান্তজনের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং ব্রাত্য মানুষের আঁতের কথা ও দৈনিক দিনলিপি তুলে আনার প্রয়াস করেছিলেন, তা আজ বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। যেখানে নিম্নবর্গের নর-নারীর সম্পর্কে স্বতন্ত্র নীতিগত চেতনা-প্রেম-স্বপ্ন-ভালোবাসা, আদিম যৌনপ্রবৃত্তি, দাম্পত্য কলহ-বিচ্ছেদ, অবৈধ সম্পর্ক, আদিমবৃত্তি, বিবাদ-ষড়যন্ত্র ও জিঘাংসার বিচিত্র প্রকাশ দেখা গিয়েছে। উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নির্মিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দেওয়ার পাশাপাশি সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায়, তাদের জীবিকার তাগিদে আমৃত্যু পরিশ্রম করার মানসিকতা, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য অন্তিম প্রয়াস ও সর্বোপরি শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার একই রকম অনুভূতি থেকে বারবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া। উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তাদের 'বাইনারি' অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে।

## ২.৫ সারাংশ

সামগ্রিক আলোচনার শেষে আমরা দেখলাম, সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনায় সমাজের নিম্নবর্গকে যেভাবে তুলে এনেছেন তাতে কাল ও পরিস্থিতির বদল অনুযায়ী নিম্নবর্গের অবস্থা ও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। একটি বৃহত্তর কালখণ্ডে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে নানা পরিবর্তন ঘটলেও নিম্নবর্গের প্রতি সমাজের ও উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি আজও ঘৃণার। নিম্নবর্গের প্রতি শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার ছবিটিও প্রায় একইরকম রয়ে গিয়েছে। নিম্নবর্গীয় জীবনে যে ন্যুনতম চাহিদা- খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য– তার অভাব চিরকালের সভ্যতায় লক্ষ করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করার সামর্থ্য জুগিয়েছে, কেউ নীরবে মার খেয়ে মার সহ্য করেছে। নিম্নবর্গের সক্রিয় অবস্থান, অধিকার আদায়ের লড়াই, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কথাই কেউ নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতি ও আবেগপ্রবণ হয়ে তাদের কথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন, কেউ কর্তব্যের দায়ে ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়ে, আবার কেউ প্রশ্ন ও যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে অথবা কেউ সাহিত্যে নতুন ধরণের উপাদান সংযোজন করতে গিয়ে নিম্নবর্গকে সাহিত্যের আধার করে তুলেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের বিপুল ও বিস্তৃত সম্ভারে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা নিম্নবর্গের জীবন বৈচিত্র্যের অধিকাংশ প্রান্তই

আজ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। নিম্নবর্গের আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পেশা, নেশা, সামাজিকতা, নিয়ম-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য বহুমাত্রিক জীবনের শিল্প ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে-যা একই সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস ও আখ্যান। বর্তমান গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা হরিশংকর জলদাসের নির্বাচিত উপন্যাস ও গল্পে নিম্নবর্গের উপরিউক্ত প্রান্তগুলিকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করব।